ভাবী-সমাজ

রেফারেন্স (আকড়) গ্রন্থ

ভাবী-সমাজ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ক্যাল্‌কাটা পাব্‌লিশার্স্‌
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীবারিদকান্তি বসু

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৩৪

৩১, সেণ্ট্রাল এভেনিউ
আর্ট প্রেসে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, বি-এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

দাম দেড় টাকা

ভাবী-সমাজ

মানুষ একা থাকিতে পারে না, একা থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। নর-বিদ্বেষী "তাইমন" (Timon) অথবা বনবাসী সন্ন্যাসীর কথা এখানে আমরা উল্লেখ না করিলেও পারি; কারণ, প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদিগকে মানুষ বলা যায় না—ইঁহারা হয় 'অতি'-মানব আর না হয় 'অব'-মানব। আমরা বলিতেছি সহজ মানুষের কথা। সহজ মানুষকে জীবন রাখিতে ও চালাইতে হইলে দরকার অপর মানুষের সহিত সংস্রব, সহবাস, মিলন। সমাজ ছাড়া মানুষ নাই। মানুষকে গোষ্ঠীবদ্ধ হইতে হইবেই। এখন এই একের সহিত অপর সকলের,

প্রত্যেকের সহিত সমস্তের, ব্যষ্টির সহিত গোষ্ঠী ও সমষ্টির ঠিক সম্বন্ধটি কি ?

দুই জনকে এক সাথে থাকিতে হইলে একটা দা'ও-না'ও (give and take) সম্বন্ধকে ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইতে হইবে, এটিও স্বতঃসিদ্ধ কথা। আমি আমার যা খুসী তাই করিতে পারি না, তুমিও তোমার যা খুসী তা করিতে পার না। নিজের স্বেচ্ছাচারকেই যদি জীবনের কেন্দ্র করিয়া তুলি তবে আমাদের পরস্পরকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেই হইবে; আর এই বিচ্ছিন্নতায়, এই একান্ত একক-ভাবে জীবনের সার্থকতা নাই, তাহা প্রথমেই বলিয়াছি। এই জন্যই গড়িয়া উঠিয়াছে সমাজের নিয়ম সব, তাহার বিধি নিষেধ,—তাহার শাস্ত্র। আমি ও আমি-ছাড়া অপর সকল, এই দুইটি সত্তার আদান-প্রদানে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে উভয়ের সংমিশ্রণ বা রসায়ন যে তৃতীয় সত্তা তাহারই নাম সমাজ।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরস্পরের মধ্যে এই যে আদান-প্রদান, ইহারও আবার বিভিন্ন ধরণ আছে। গোড়ায় এই আদান-প্রদান হইয়া থাকে অজ্ঞানতঃ, প্রয়োজনের বশে—এইরূপেই রীতি, আচার ব্যবহার বা unwritten

law গড়িয়া উঠে, এবং এই 'অলিখিত' বিধানের প্রয়োগের জন্য দাঁড়ান দণ্ডকর্ত্তা রাষ্ট্রপতি, সমাজপতি ও তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ। অজ্ঞানে, প্রয়োজনের তাড়নায় যখন সমাজ বাঁধিয়া উঠিতেছে তখন প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ থাকিবেই, এই রকম যুদ্ধেরই ফলে যেন সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু যুদ্ধের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই আছে, শৃঙ্খলা চলন-সই রকম স্থাপিত হইয়া গেলেও, স্বেচ্ছাচারী যখন তখন উদ্ভূত হইতে পারে, তাই তাহাকে গণ্ডীর ভিতরে রাখিবার জন্য বা অতি পরাক্রমশালী হইলে তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিবার জন্য দরকার হয় সমাজের একটা কেন্দ্রীভূত শক্তি, তাই হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট, সরকার, পঞ্চায়েত—সমাজের প্রতিনিধি। এই সমাজের প্রতিনিধিরাই পরে আবার নূতন নূতন নিয়ম-কানুনের প্রবর্ত্তন করেন, সজ্ঞানে সমাজকে সংহত শৃঙ্খলিত করিয়া তুলিতে চাহেন; যদি তাঁহারা প্রয়োজন বোধ করেন সমাজ রক্ষার্থ তাঁহারা সমাজ-অন্তর্গত সকল ব্যক্তির উপর জোর-জবরদস্তিও করেন।

এখনও মানব-সমাজ এই দ্বন্দ্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দ্বন্দ্ব চলিয়াছে তিন দিক হইতে (triangular). প্রত্যেক ব্যক্তিকে দ্বন্দ্ব করিতে হয় প্রত্যেক অপর ব্যক্তির

সহিত আর সমবেত সমাজের একটা প্রতিনিধি-শক্তির সহিত। ব্যষ্টির সহিত ব্যষ্টির প্রতিযোগিতা আর্থিক বিষয়ে (economic) আর সমষ্টির সহিত তাহার প্রতিযোগিতা নৈতিক বিষয়ে। ব্যক্তি যে মুহূর্ত্তে সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই আপনার প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, নৈসর্গিক স্বাতন্ত্র্যকে কিছু খর্ব্ব করিয়াই তাহাকে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু বাধ্য হইয়া এই যে সে নিজের উপর সংযম বা নিগ্রহ করিতেছে, ইহাতে তাহার প্রাণের সম্পূর্ণ অনুমতি নাই। সমাজের মধ্যে থাকিয়াও তাহার প্রাণ তবু চায় স্বচ্ছন্দগতি, যথেচ্ছকর্ম্ম—বন্ধনের মধ্যে মুক্তি। এই মুক্তি, স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের সহজতম অনুভূতি, প্রথম আস্বাদ মানুষে চায় নিজের অধিকার, মমত্বের মধ্যে। কর্ত্তৃত্ব যতখানি বাড়াইতে পারিয়াছি—কর্ম্মক্ষেত্র, ভোগ্যবস্তুর উপর যত অবিসম্বাদী দখল আমার, নিজেকে ততখানি আমি স্বাধীন মুক্ত বলিয়া বোধ করি। মাল্‌থস্ (Malthus) যে বলিয়াছেন পৃথিবীর খাদ্যের অনুপাতে লোক-সংখ্যা অনেক বেশী বাড়িয়া যাইতেছে,—কিন্তু ইহার দরুণ লোকের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা (economic struggle) ততখানি চলিতেছে না যতখানি চলিতেছে

প্রত্যেক মানুষের প্রাণে অধিকার-বোধের ভিতর দিয়া যে স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠার লিপ্সা আছে সেই জন্য। এনার্কিষ্টগণ (Anarchists) সমাজের বিধি-বাঁধন বা রাষ্ট্রশক্তির আইন-কানুন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিতে চাহিতেছে (moral struggle), তাহারও কারণ কেবল সমাজের বা সমষ্টির পীড়ন বা অত্যাচার নয়, অন্ততঃ উহা ভিতরের কারণ নয়, ভিতরের কারণ হইতেছে—বাহিরের পীড়ন বা অত্যাচার হউক বা না হউক—মানুষ চাহিতেছে সমাজের সমষ্টির মধ্যে ফিরিয়া আবার সেই আদিম প্রাকৃতিক স্বেচ্ছাতন্ত্রের মত কিছু স্থাপন করিতে, এই স্বাধীনতা অথবা স্বেচ্ছা-আচার স্পৃহার জন্যই সে বলিতেছে—Good government is no substitute for self-government.

কিন্তু বস্তুতঃ আদিম-তন্ত্রে মানুষের পৌঁছিবার আর উপায় নাই, একবার যাহা পার হইয়া আসিয়াছি ঠিক তাহাতেই আবার ঘুরিয়া আসা সম্ভবপর নয়। মানুষ একলা থাকিবে না, একলা থাকিবার ফলে তাহার যে পূর্ণ-স্বাতন্ত্র্য বা স্বেচ্ছাচারের অধিকার তাহাও সে পাইবে না। বহুর সাথে সমস্তের সাথে মিলিয়া মিশিয়া তাহাকে থাকিতে হইবেই—অথচ সে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য চাহিবে— এ

সমস্যার মীমাংসা হইবে কিরূপে? তবে কি সমাজে থাকিলে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ তাহার জীবনের সাথী, জীবন-অভিব্যক্তির উপায়? ডারউইনের (Darwin) struggle ও survivalই (দ্বন্দ্ব ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন) কি মানব সমাজেরও একমাত্র মূলতন্ত্র? সমাজের মধ্যে থাকিলে মানুষ পূর্ণ-স্বাতন্ত্র্য কখন পাইবে না, তবে তাহার সমস্ত প্রয়াস হইবে এই পূর্ণ-স্বাতন্ত্র্য বা স্বেচ্ছাচারেরই জন্য যুদ্ধ করিয়া যাওয়া?

কিন্তু তাহা ঠিক বোধ হয় না। কারণ বলা যাইতে পারে, মানুষের সমাজ দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতাই সব কথা নয়। মানুষের মধ্যে সহযোগিতা বলিয়াও একটা জিনিষ দেখি। যদি দ্বন্দ্বই একমাত্র নিয়ম হইত, ব্যষ্টিকে স্বাতন্ত্র্যের জন্য যদি সংঘর্ষকেই আবাহন করিতে হইত তবে সমাজ বলিয়া জিনিষটি বহুদিন আগেই লোপ পাইত। Competition শুধু নয়, co-operationও মানব-মনের, মানব-সমাজের একটা ধারা। মানুষ শুধু নিজের জন্য ভাবে না, পরের জন্যও ভাবে। মানুষ সমাজে থাকে ও থাকিতে চায় কেবল নিজের জন্য নয়, সমাজের জন্যও বটে। মানুষ নিজের শ্রীবৃদ্ধি যেমন চায়, দেশের দশের শ্রীবৃদ্ধিও কি

তেমনি চায় না? মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে, কারণ গোষ্ঠীর মধ্যে সে একটা আপনার বৃহত্তর সত্তা পায়, একান্ত নিজেরই সুখ সুবিধার জন্য নয়।

কথাটা আর একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। মানুষ মানুষের সহিত মিশিয়াছে কেবল প্রয়োজনের তাড়নায় নয়, একটা প্রাণেরই টানে। কিন্তু এই প্রাণের টান অর্থ কি? মানুষ মানুষকে ভালবাসে, একটা অহেতুক স্নেহের ডোরে সমাজ ভিতরে ভিতরে বাঁধা আছে—ইহা কতখানি সত্য? বাস্তবে, প্রকাশে, কর্ম্মের মধ্যে আমরা মানব-মনের কি পরিচয় পাই? আমি অপরের সহযোগ—co-operation চাই কখন, কেন অপরের সহিত সংযুক্ত হইতে চাই? একক থাকিলে স্বতন্ত্র আমি হইতে পারি, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলা দুষ্কর। একলা থাকিয়া শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি করি মাত্র, সংঘর্ষের যুদ্ধের মাত্রা আমার যত বাড়িয়া যায়, আমার জয়ের সম্ভাবনা ততই কমিয়া যায়। তাই ত গোষ্ঠীবদ্ধ হই। একই লক্ষ্যের একই স্বার্থের লোক লইয়া সংঘ গঠন করি—সুবিধার জন্য। ইহা যুদ্ধের কৌশল মাত্র। আমরা সতীর্থ, প্রাণের টানে নয়, প্রাণের দায়ে। মানুষ বুদ্ধিমান চালাক হইয়াছে, শুধু সে পূর্ব্বের মত অথবা

চিরন্তন স্বভাবের মত নিজেকেই চায়, তবে এখন সে চলিতে শিখিতেছে তাহার enlightened self-interest —উচ্চতর স্বার্থ অনুসারে।

সহযোগিতাও (co-operation) প্রতিযোগিতারই (competition) আর এক মূর্ত্তি। সহযোগিতার মূলে আছে স্বার্থই। নিজের নিজের লাভ বেশী হইতেছে যেখানে যেভাবে, আমরা সেখানে সেই ভাবে সহযোগ দিতেছি ও চাহিতেছি। স্বার্থ যত বেশী, সহযোগিতাও তত দৃঢ়। কিন্তু যখনই স্বার্থের বিরুদ্ধে স্বার্থ দাঁড়াইয়াছে, তখনই সহযোগও ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর এইরূপ ভাঙ্গা অবশ্যম্ভাবী। অনেকগুলি স্বার্থ কোনদিনই এক সাথে বহুকাল টিকিতে পারে না। এক এক স্বার্থ আপন আপন দিকে টানিবেই, আপন আপন চরম সার্থকতার দিকে ছুটিবেই। প্রথমে ধরা যাউক গোষ্ঠীগত স্বার্থের কথা। ইউরোপের ইতিহাসে আমরা কি দেখিতে পাই? ইউরোপের সমাজে বিভিন্ন যুগে চারিটি বৃহৎ সংঘশক্তির খেলা চলিয়াছে—রাজশক্তি, পৌরহিত্যশক্তি, সামন্ত-রাজ-শক্তি (feudalism,— আমাদের দেশের উপর বলা যাইতে পারে, জমীদার-শক্তি) আর সাধারণ প্রজাশক্তি। কিন্তু এই বিভিন্ন

শক্তি সমুদয় আপন আপন স্বার্থ অনুসারে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়াছে, কোন বিশেষ শত্রু-শক্তিকে খর্ব্ব করিবার জন্য। এক যুগে যাহা মিত্র-শক্তি অন্য যুগে তাহাই শত্রু-শক্তি, এক যুগে যাহা শত্রু-শক্তি অন্য যুগে তাহা মিত্র-শক্তি হইয়াছে—চিরকাল এইরূপ স্বার্থের দায়েই ভাঙ্গাচুরা চলিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে * বিভিন্ন জাতি-শক্তির মধ্যে এই রকমই দেখিতেছি সহযোগিতার তলে তলে প্রতিযোগিতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর আধুনিক যুগে সমাজের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্তরে শ্রেণীতে শ্রেণীতে একটা যুদ্ধ (class war) বাধিয়া উঠিতেছে দেখিতেছি সেখানেও সঙ্ঘবদ্ধ সকলে হইতেছে, সহযোগিতা বেশী দৃঢ় করা হইতেছে প্রতিযোগিতার জন্য। ভারতবর্ষেও একটা class war ঘটিতেছে—শ্রমজীবী ও মহাজনে এখানে সংঘর্ষ তেমন করিয়া এখনও ফুটে নাই, কিন্তু সামাজিক বর্ণের সঙ্ঘে সঙ্ঘে, যেমন ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে, রেশা-রেশি দেখা দিয়াছে। গোষ্ঠী বা সংঘের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা ব্যষ্টির দিকে তাকাই, সেখানেও দেখি সহযোগিতার বন্ধনকে কাটিয়া প্রতিযোগিতার

* ১৯১৪-১৯১৮ সালের ইউরোপীয় যুদ্ধ।

স্বাতন্ত্র্যের উপরই জীবনকে খাড়া করিবার একটা গতিধারা। ভারতে সমাজের কেন্দ্র (unit) ছিল একান্নবর্ত্তী পরিবার, কিন্তু তাহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপীয় সমাজের মত দম্পতীই হইয়া উঠিতেছে এক একটা কেন্দ্র। কিন্তু এখানেও তাহার শেষ হইতেছে না। আমেরিকা যেন দেখাইতেছে দম্পতীর সম্বন্ধও ভাঙ্গিতে হইবে। দম্পতীর যে সহযোগ তাহাও ক্ষণিক সুখ সুবিধার জন্য। স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পুরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর সমাজকে ক্রমে দাঁড়াইতে হইতেছে। প্রত্যেককে নিজেরই দিকে দেখিতে হইতেছে, নিজেরই উপর ভর করিতে হইতেছে, নিজের দায়িত্ব নিজেকেই লইতে হইতেছে, নিজের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতি নিজেকেই করিয়া লইতে হইতেছে—chacun pour soi.

ইহা হইতেছে, আর ইহা হওয়াও উচিত। কারণ, নিজের শক্তিকে চিনিবার, বাড়াইবার ইহা একমাত্র পন্থা। ঘর্ষণে যেমন চন্দনের সৌরভ ফুটিয়া উঠে, সেই রকম সংঘর্ষেই ব্যষ্টির প্রতিভা প্রজ্বলিত হয়। যে সমাজ যতখানি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ দিয়াছে, সেই সমাজই ততখানি উন্নত, জীবন্ত। সহযোগিতা

(co-operation) একটা চুক্তিমাত্র, যুদ্ধের একটা ছল বা কৌশল। মানুষ সহযোগী চাহিতেছে,—সহযোগী চাওয়া তার উচিত—এই আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মস্ফুরণের সুবিধার জন্য। মানুষের গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ মানুষের ব্যক্তিগত সার্থকতার অবলম্বন, উপায় মাত্র।

কিন্তু এই উপায় যখন আদর্শ হইয়া পড়ে, যে জন্য ইহার উদ্ভব হইয়াছে তাহা ভুলিয়া গিয়া, ইহাকে স্বয়ম্ভূ বা স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লই, তখনই ধ্বংসের বীজ বপন করি—ব্যষ্টি-ধর্ম্মের উপরে যখন গোষ্ঠী বা সমষ্টি-ধর্ম্মকে চাপাইতে আরম্ভ করি তখনই ব্যষ্টির, গোষ্ঠীর, সমষ্টির অবনতি সুরু হইল। একটা গোষ্ঠীকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া (জর্ম্মনীর State idea) তুলি অথবা সমষ্টিকেই ব্যষ্টির নিয়ামক করিয়া তুলি (Socialism), তাহাতে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া সমাজকে ও মানুষকেই খর্ব্ব করিয়া তুলি। সুতরাং প্রতিযোগিতাকে যাঁহারা তুলিয়া দিতে চাহিতেছেন তাঁহারা সমাজ-প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে ত চলিতেছেনই, আদর্শেরও বিরুদ্ধে চলিতেছেন।

কিন্তু এখানে আবার আমরা প্রশ্ন করিতে পারি, স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিযোগিতায় যে সম্বন্ধ তাহা কি অঙ্গাঙ্গীর

সম্বন্ধ? স্বীকার করিলাম ব্যক্তি চাহিতেছে স্বাতন্ত্র্য, আপনার পূর্ণ অভিব্যক্তি, কিন্তু তাহার অর্থই কি দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ? মানুষের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ হইবার যে প্রেরণা (Herd instinct), তাহা কি প্রকৃতির প্রয়োজনেরই তাড়নায় উদ্ভব হইয়াছে, না তাহার সঙ্গে অন্য রকম কারণও কিছু মিশ্রিত আছে? ফলতঃ আমরা বলিব, যাঁহারা সমাজকে দেখিতেছেন প্রতিযোগিতা, অসম্বৃত দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া (Red in tooth and claw) তাঁহারা মানুষের একটা দিকই শুধু দেখিতেছেন—স্থূলতর দিকটি, মানুষের প্রাণময় সত্তা; আর যাঁহারা সহযোগিতা বা অর্দ্ধেক দ্বন্দ্ব ও অর্দ্ধেক মিলনের মধ্য দিয়া দেখিতেছেন তাঁহারা মানুষের পাইয়াছেন মনোময় সত্তাটি। কিন্তু অন্ন-প্রাণ ছাড়া, মন ছাড়া মানুষের আর কোন প্রেরণা নাই কি, আর কোন আবেগ, ইষণা শক্তি তাহার জীবনে ফুটিয়া উঠিতেছে না, জীবনের উপর প্রভাব রাখিয়া যাইতেছে না?

মানুষে মানুষে মিলিয়া যে সমাজবদ্ধ হইয়াছে তাহা জীবন-সংগ্রামের চাপের ফল, তাহা বাহির হইতে জোর করিয়া দেওয়া ধর্ম্ম অথবা উহা ব্যষ্টিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছল-বল-প্রণোদিত চুক্তি, শুধু এইটুকু বলিলে সব

কথা বলা হইল না। পরের সাথে মানুষ মিশিতে চায়, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধু মেশার আনন্দের জন্য। অপরের সাথে মানুষ লেনা-দেনা করিতে চায়, কেবল নিজের ভাণ্ডারকে বাড়াইবার জন্যই নয়, ইহাতে সে তৃপ্তি পায় বলিয়া। এই মেলা-মেশা, এই লেনা-দেনার ফলে তাহার অনেক লাভ হইতে পারে, কিন্তু শুধু এই লাভের জন্য, এই লাভকেই সম্মুখে বা গোপনে উদ্দেশ্য-রূপে রাখিয়া সে যে মেলা-মেশা লেনা-দেনা করে, ইহাও সত্য নয়। মানুষের এক অংশে এক ক্ষেত্রে, প্রতি-যোগিতা যেমন ধর্ম্ম, আর এক অংশে আর এক ক্ষেত্রে সহযোগিতা তেমনই ধর্ম্ম, তেমনই আবার আর এক অংশে আর এক ক্ষেত্রে তাহার ধর্ম্ম একাত্মতা। এই একাত্মতা সজ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, অনুভব করে বলিয়াই, তাহার এই মেলা-মেশা, লেনা-দেনা সকলের মধ্যে থাকিয়া, সকলের সাথে চলিয়া ফিরিয়া, সে যেন বাস্তবিকই পায় নিজের এক বৃহত্তর সত্তা, গভীরতর জীবন, মহত্তর সার্থকতা। কেবলই দ্বন্দ্ব অথবা শুধু স্বার্থনিয়মিত সহযোগ, তাহার সত্তার, জীবনের বাহির-কার দৃশ্য, কিন্তু ভিতরে লুক্কায়িত আছে নিঃস্বার্থ অহেতুক মিলনের আনন্দ, দ্বন্দ্বের মধ্যে, সন্ধির মধ্যেও এই মিলন-

আনন্দই বিপরীতভাবে, কিন্তু কখন আবার ঋজুভাবেই দেখা দিতেছে। পিতামাতা সন্তানকে স্নেহ করে, সন্তানের নিকট হইতে উপকার পাইবার আশায় নহে—এ রকম আশা সে স্নেহের মধ্যে জড়িত থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আসল মূল নয়, মূল হইতেছে সন্তানের উপর পিতামাতার নাড়ীর টান—হইতে পারে সন্তানের মধ্যে পিতামাতা আপনাকেই দেখে বলিয়া এই স্নেহ জন্মে, কিন্তু সেই 'আপন' পিতামাতার সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত 'আপন' নহে, তাহা হইতেছে সন্তানকে লইয়া সন্তানের সত্তার সহিত মিশিয়া গিয়া তাহার যে বৰ্দ্ধিত সত্তা। নিজের আত্মাই ভালবাসার উৎস বটে, কিন্তু সেই নিজের আত্মায় পরের আত্মাও জুড়িয়া গিয়াছে, সে আত্মা পরের আত্মা হইতে পৃথক খণ্ডিত অহঙ্কার নয়। তারপর যেখানে চোখে দেখিতেছি শুধু দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, সেই দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের অর্থ হইতেছে মিলনের সামঞ্জস্যের চেষ্টা। ভিতরে একটা নিবিড় ঐক্য আছে, সেই ঐক্য মনের প্রাণের বাধা ঠেলিয়া বাহিরে প্রতিষ্ঠা চাহিতেছে, মনে প্রাণে অন্তরাত্মার একত্ব ফুটাইয়া ধরিতে যত্ন করিতেছে, তাই এত দ্বন্দ্ব, এত সংঘর্ষ। মানুষ শুধু বাঁচিয়া থাকিতে চায় (will to live), আপনাকে বাড়াইয়া তুলিতে

চায় (will to power), সেই জন্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই জন্যই সমাজ থাকিবে ও চলিবে—ইহা অপেক্ষাও গভীরতর সত্য মানুষ মানুষকে ভালবাসিতে চায় (will to love), পরের মধ্যে নিজের চারিদিকে নিজেকে পাইতে চায়, সেই জন্যই সমাজে গোষ্ঠী ও সঙ্ঘ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য সে চলিয়াছে।

মানুষ চায় মানুষের স্পর্শ—পরের মধ্যে নিজের আত্মার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু পরের মধ্যে নিজেকে পাওয়ার অব্যর্থ অনুবন্ধ হইয়াছে নিজের মধ্যে পরকে পাওয়া, নিজের মধ্যে অপরের আত্ম-প্রতিষ্ঠা। ঠিক এই কথাটি-কেই কিন্তু তাহার মন ও প্রাণ ঠিক বুঝিতে ধরিতে দেয় না, তাই সমাজের যত গোলমাল; এই কথাটি ভুলিয়া গিয়া সমাজবন্ধনের, গোষ্ঠী বা সংঘ গঠনের চেষ্টা সে করিয়াছে বলিয়া সমাজ, গোষ্ঠী, সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে, ব্যষ্টিই ব্যক্তিগত অহঙ্কারই হইয়া পড়িতেছে চরম সাধনা ও সিদ্ধি।

নিজেরই মধ্যে নিজে মানুষ সম্পূর্ণ নয়, অন্ততঃ এই সম্পূর্ণতাকে প্রকাশ করিবার জন্য, বাহিরে খেলাইয়া তুলি-বার জন্য চাই অপরের সংসর্গ। একায় ভোগ হয় না, শক্তিরও

ভোগ হয় না, ভালবাসারও ভোগ হয় না। কিন্তু দুই-এর সংসর্গে প্রথমে উঠিয়া দাঁড়ায় সংঘর্ষ। কারণ বাধা পাইয়াই মানুষ প্রথমে আপনার সম্বন্ধে সচেতন হয়, এবং আপনাকে বেশী করিয়া পাইতে চায় বলিয়া সম্মুখে একটা বাধাকেই সজীব করিয়া রাখার মধ্যে মানুষের এত আনন্দ। এই রকমেই সে নিজের নিজত্ব ও সামর্থ্য অনুভব করে, ফুটাইয়া তোলে। তাই মানুষ দেখি সংঘ সমাজ গড়ে যেন তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য। কিন্তু মানবজাতির জীবন-যাত্রায় এটা একটা বিশেষ স্তর মাত্র, একটা বিশেষ অবস্থার ব্যবস্থা মাত্র। কিছু অগ্রসর হইলে, কিছু জ্ঞান হইলে আমরা দেখি, আমরা বুঝিতে পারি, নিজের নিজত্ব অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাধার দরকার নাই, পর হইতে পৃথক বোধ করিবার, পরের বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করাইবার কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। সহযোগ-তন্ত্রে এই কথাটি অনেকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিজের দুর্ভেদ্য গণ্ডীটা সেখানে একেবারে মুছিয়া না গেলেও কিছু মোলায়েম হইয়া আসিয়াছে। আরও অগ্রসর হইলে, আরও জ্ঞান হইলে দেখি, স্বাতন্ত্র্য অর্থ সংঘর্ষ ত নয়ই নয়, স্বাতন্ত্র্যেই শ্রেষ্ঠ মিলন; সমাজের, সংঘের মধ্য দিয়াই পূর্ণ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিতে পারে। পরকে যতক্ষণ পর বলিয়া বাহিরে ঠেলিয়া রাখিতে চেষ্টা করি, পরও ততক্ষণ আমারই উপর চাপিয়া পড়িতে চেষ্টা করে, আমার স্বাতন্ত্র্য ততই তাহাতে খর্ব্ব হইয়া পড়ে, পাখা মেলিয়া উড়িয়া চলিবার ততই কম অবকাশ পায়। পরের মধ্যে আমাকে দেখি ও আমার মধ্যে পরকে দেখি বলিয়া পরস্পরের আদান-প্রদান যখন সরল সহজ স্বাভাবিক স্বতঃস্ফুর্ত্ত হয় তখনই প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে পূর্ণ শক্তি খেলিয়া উঠে। সকলের একাত্মতার মধ্যে প্রত্যেকেই দেখে, অনুভব করে, একটা সুবৃহৎ মুক্তি, অনন্ত প্রকাশের অসীম প্রসার।

এই একাত্মতায় যখন পৌঁছি তখন প্রত্যেক এককের মধ্যে দেখি, নিজেরই শক্তির, নিজেরই সামর্থ্যের প্রতিরূপ; আমার কর্ম্মের দ্বারা আমার নিজের কর্ম্ম ত উপচিত হইতেছেই, পরের কর্ম্মও উপচিত হইয়া চলিয়াছে, আবার অপরের কর্ম্ম তাহার নিজের কর্ম্মকে উপচিত করিয়া আমারই কর্ম্মকে উপচিত করিতেছে। মানুষের ভোগ-সামর্থ্যের অনুযায়ী রসদের অভাব যে পৃথিবীতে আছে তাহা নয়, অভাব শুধু রসদের যথাযথ ভাগবাটরার বা বিলি-বন্দোবস্তের। এই বন্দোবস্ত ঠিক

মত যে হয় না, তাহার কারণ মানুষের একটা অমূলক আশঙ্কা, একটা অধীর ত্বরা, প্রাণের ও মনের ভাসা ভাসা আবেগ। সামর্থ্য যতখানি বা প্রয়োজন যতখানি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আমাদের আকাঙ্ক্ষা ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠে, হজম যতখানি করিতে পারি না, গ্রাস করিতে চাই ততখানি। তাই আমাদের হয় ঈশপ কথিত ভেকের দশা—Ruat mole sua—নিজের ভারেই নিজে ভাঙ্গিয়া চুরমার হই। সকলের এরকম ভাবের দরকার হয় না, একজনের হইলেই যথেষ্ট। একদিকে অতিবৃদ্ধি হইলে, আরও অনেক দিকে অতিবৃদ্ধি হয়,—তার অপেক্ষা বেশী দিকে হয় অতি-ক্ষয়, আকাঙ্ক্ষার অভাব, অবসাদ, দুর্ব্বলতা, হতাশা। কিন্তু সকলে মিলিয়া একই বিরাট অসঙ্গতি সৃষ্টি করে। সকলের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি ?

অনেকে হয়ত আশঙ্কা করিবেন এই একাত্মতার ফল হইতেছে একাকার; অতিবৃদ্ধি ও অতিক্ষয়ের হাত এড়াইতে গিয়া মানুষ হইয়া পড়িবে অতি সাধারণ (mediocre). কিন্তু তাহা হয় শুধু যখন বাহিরের আইন-কানুন, বিধি-নিষেধের জোরে এই একাত্মতা স্থাপন করিতে আমরা চেষ্টা করি। গোড়া হইতে,

প্রত্যেক মানুষ হইতে সংঘ-শক্তি গড়িবার চেষ্টা না করিয়া আমরা উপর হইতে একটা কেন্দ্রগত সংঘশক্তি হইতে সমাজকে, মানুষকে গড়িতে বা চালাইতে চেষ্টা করি। Socialismএর ভুল এইখানে যে সে বাহির হইতে একটা কেন্দ্রগত শক্তির চাপে ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে সাম্য ও মিলনের চেষ্টা করিতেছে। আমরা বলিয়াছি, কেন্দ্রগত সমাজশক্তি ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে আদান-প্রদানের ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ঐ সমাজশক্তি দিয়া ব্যষ্টির আদান-প্রদান নিয়মিত বা পরিচালিত করিতে না গিয়া, করা উচিত ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে আদান-প্রদানের ধরণের পরিবর্ত্তন, যাহাতে সমাজশক্তি পায় একটা নূতনতর উচ্চতর মূর্ত্তি। এই ভাবে ব্যক্তি হইতে ব্যষ্টি হইতে যখন আরম্ভ করি, ব্যক্তির ব্যষ্টির পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের সাহায্যেই সমাজকে গড়িয়া উঠিতে দেই, তখন দেখি, সমাজ একাকারও নয়, অতি-সাধারণও নয়, তাহা বহুল বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাহাই গরিষ্ঠ। আর সে সমাজ যে প্রতিযোগিতা বা নামমাত্র সহ-যোগিতার উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে এমনও কোন কথা নাই। মানুষ সমাজ গড়িয়াছে পরের সহিত মিলিবার জন্য, পরের মধ্যে থাকিয়া আপনার ও পরের শ্রীকে বিভূতিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ; পরের সহিত যুদ্ধ

করিবার জন্য নয়, পরের উপর আপনার প্রভুত্ব খাটাইবার জন্য নয়। এই শেষোক্ত পন্থায় যতদিন চলিয়াছে ততদিন তাই তাহার প্রকৃত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠে নাই, ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার ব্যক্তিগত আত্মম্ভরিতা; তাই প্রকৃত সমাজ, প্রকৃত সঙ্ঘ, প্রকৃত গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যকে ফুটাইয়া ধরিবার পথে তাহার সাময়িক সমাজ, সঙ্ঘ, গোষ্ঠী সব ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে। প্রকৃতির টানে তাই সে দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি ছাড়াইয়া আর একটা বৃত্তি, আর একটা প্রেরণার আশ্রয় লইতে চলিয়াছে।

ভাবী-সমাজ

২

একাত্মতার উপর নূতন সমাজকে দাঁড়াইতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জানিতে হইবে, চিনিতে হইবে, ধরিতে হইবে আপন আপন আত্মাকে। আত্মা কথাটি শুনিয়া কেহ ভড়কাইবেন না, ইহা খুব রহস্যময় প্রহেলিকা কিছু নয়; যাঁহারা ইহাকে ঐরূপ করিয়া তুলিয়াছিলেন, দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিব, কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিব না। মানুষের আছে প্রাণের দায়, মানুষের আছে মনের তাড়া, সেই রকমই মানুষের আছে আত্মার প্রেরণা অর্থাৎ তাহার নিগূঢ় স্বভাবের গতি। নিজের

এই সব-চেয়ে ভিতরকার সত্তা ও প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া তবে কর্ম্ম করিতে হইবে। প্রত্যেকে যদি আপন আত্মার প্রেরণায় পূর্ণ ও মুক্ত ভাবে আপনাকে চলিতে দেয়, করিতে থাকে যদি 'স্বভাব-নিয়তং কর্ম্ম', তবে আর সংঘর্ষের কোন প্রশ্ন উঠে না। কারণ, সংঘর্ষের সম্ভাবনা হয় তখন যখন একজনের দেখাদেখি সকলে মিলিয়া একই সঙ্কীর্ণ রাস্তায় ত্রস্তে ঢুকিয়া পড়ি ও ছুটিয়া চলি; ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হয় তখন যখন জিনিষের উপর আমাদের সমস্ত দৃষ্টি ও লোভ যাইয়া পড়ে কিন্তু ভুলিয়া যাই যখন নিজের ভিতরের স্বভাবের টান। তাহা না করিয়া, যদি আগে ভিতরটার সাথে বুঝাপড়া করি, যদি অন্তরাত্মার দাবী অনুসারে চলি তবে দেখিব কত বিচিত্র রাস্তা আমাদের প্রত্যেকের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে, আমাদের সমবেত কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার কতখানি বাড়িয়া গিয়াছে, প্রত্যেকের চারিদিকে হাঁফ ছাড়িয়া চলিবার যথেষ্ট অবকাশ হইয়াছে। পথের, কর্ম্মক্ষেত্রের ন্যূনতা যে আমরা অনুভব করি, বাস্তবিক পক্ষে তাহা পথের বা কর্ম্মক্ষেত্রের প্রকৃত অভাব ততখানি নয় যতখানি তাহা আমাদের অসহিষ্ণুতা, সম্মুখে যাহা কিছু পাই তাহা লইয়া ধরিয়া পড়িবার যে ব্যস্ততা তারই ফল।

তারপর অন্তরাত্মার ধর্ম্মই হইতেছে মিলন, ঐক্য। মানুষের সাথে মানুষের বিবাদ দেহের প্রাণের ও মনের ক্ষেত্রে—যতক্ষণ থাকি এই-কয়টির মধ্যে, ইহাদেরই দাবী-দাওয়াকে চরম করিয়া তুলি, ইহাদেরই টানে নিজেকে হারাইয়া ফেলি, ভাসাইয়া দেই, ততক্ষণ একরোখা স্বাতন্ত্র্য হয় আমাদের লক্ষ্য, ছল ও বল হয় আমাদের উপায়। কিন্তু ইহাদের উপরে যদি উঠিয়া যাই, যদি দেখি অনুভব করি ইহাদেরও ভিতরে পিছনে আছে আমার প্রকৃত সত্তা, আমার প্রকৃত স্বভাব তখন সেই সঙ্গেই দেখিব, অনুভব করিব যে আমা-ছাড়া অপরেরও আছে তাহার দেহের প্রাণের মনের অধীর দাবী-দাওয়ার উপরে ভিতরে বা পশ্চাতে আমারই মত একটা নিভৃত সত্তা ও স্বভাব। আর এই দুই সত্তা ও দুই স্বভাব দাঁড়াইয়া আছে এমন একটি স্তরে যেখানে তাহাদের মিল অব্যর্থ, কারণ সেখানে তাহারা একই জিনিষের দুইটি দিক বা প্রকাশের ভঙ্গী সেই স্তরে সর্ব্বদা সজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত রহিলে, আমাদের পরস্পরের নীচের দ্বন্দ্বের স্তরগুলিও ক্রমে ক্রমে পায় একটা নিবিড় অটুট সামঞ্জস্য। প্রত্যেকে যখন আমরা এই অন্তরাত্মায় ভর করিয়া থাকি, ও সেই অনুসারে স্বভাব ও স্বধর্ম্মের টানে আপন আপন পথ ও ক্ষেত্র

করিয়া চলি তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈচিত্র্য লইয়া হইয়া উঠে সমষ্টির বা সঙ্ঘের পৃথক অথচ সম্মিলিত অঙ্গ-চেষ্টা (organic function).

প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে, কোথায় এই অন্তরাত্মা, কোথায় এই নিগূঢ় নিবিড় মিলন-ধর্ম্ম, বাস্তবে তাহার ত চিহ্ন কিছু দেখিতে পাই না, ইহা যে কল্পনা আকাশ-কুসুম নয় তাই বা কে বলিল ? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে প্রত্যেকের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা চাই নিজের ভিতরে, আপন আপন হৃদয়-কন্দরে। ভাল করিয়া স্থিতধী হইয়া দেখিলে প্রত্যেকেই কি নিজের নিজের মধ্যে এই রকম একটা মুক্তির ঐক্যের সামঞ্জস্যের ভাব অনুভব করে না ? বাহিরের চাপ হইতে, দেহের তাড়া, প্রাণের দায়, মনের সংস্কার হইতে একটু নিষ্কৃতি পাইলে কখন কোন মুহূর্ত্তে মানুষ কি এই রকম একটা উদার দিব্যসত্তার সন্ধান পায় না ? প্রত্যেকেই পায়, তবে বিশ্বাস করে না, প্রত্যেকেই মনে করে এ জিনিষটি নিজের ব্যক্তিগত খেয়াল, বাস্তব-সত্য যাহা তাহার একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। কিন্তু এ সন্দেহ কেন হয় না, যে তাহা সত্যও হইতে পারে ? এই নিভৃত সত্যকে বাস্তবে ফুটাইয়া তুলিবার কোন অবকাশই যে আমরা দিই না।

উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ—সেই রকম এই অন্তরাত্মার সত্যও প্রত্যেকের মধ্যে উঠে, উঠিয়া আবার বুদ্‌বুদের মত বিলীন হইয়া যায় ; পাগল নির্ব্বোধ আখ্যা পাইব বলিয়া আমরা কাহারও কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করি না, তাহা লইয়া পরস্পর পরস্পরের কাছে বুঝা-পড়া করিতে চাই না, নিজের নিজের মধ্যে তাহাকে আটকাইয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলি। দুই এক জন কবি ঋষির মুখ দিয়া তাহা বাহির হইয়া পড়ে, আমাদের প্রাণের তন্ত্রী একটা তখনই বাজিয়া উঠে কিন্তু যত সত্বর পারি সুবোধ হইতে চেষ্টা করি, কবিকে ঋষিকে বাহবা দিয়া সরিয়া পড়ি।

ফলতঃ বাস্তবে যে অন্তরাত্মার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা পায় নাই তাহার কারণ আমাদের এই নিষ্ঠার অভাব। প্রথমতঃ আমরা ইহাকে ভাল করিয়া দেখিতে বুঝিতে চাই নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহার স্থাপনের জন্য বিশেষ কোন প্রয়াস করি নাই। সমাজকে গড়িয়া উঠিতে দিয়াছি নীচের প্রকৃতি স্বভাবতঃ যে রকম ভাবে তাহাকে গড়িয়া লইয়াছে সেই ভাবেই। আমাদের ভিতরের অনুভবকে, উচ্চতর প্রেরণাকে বলি দিয়া বাহিরের নিম্নতর তাড়নাকেই অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু বলা যাইতে পারে, সমাজ যখন এই

ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে, এই ভাবেই চলিতেছে, তখন সমাজের এইটিই সনাতন নিয়ম; অন্তরাত্মার ধর্ম্মে সমাজকে গড়িয়া তুলিবার নিষ্ঠাও আমাদের নাই চেষ্টাও নাই, ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে সমাজ-সত্তার মধ্যে এমন একটি অঙ্গীভূত বস্তু আছে যাহা ঐ জিনিষটিকে চাহে না, চাহিতে পারে না। কোন না কোন রকম সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত—দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ না থাকিলে সমাজও থাকে না।

কিন্তু ইহা শুধু আমাদের অভ্যাস ও সংস্কারের কথা। সমাজ একভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া যে আর একভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না, এ কথা প্রাণ আমাদের বিশ্বাস করিতে না চাহিলেও ইতিহাস যে ইহার সাক্ষ্য বা ন্যায়-শাস্ত্র ইহার প্রমাণ দিবে এমন বোধ হয় না। মানুষ তাহার অভ্যাস ও সংস্কারকে যতই দৃঢ় অব্যভিচারী সনাতন—যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ—বলিয়া ধরিয়া লউক না কেন, কোন অভ্যাস কোন সংস্কারই তেমন নয়। অভ্যাসের সংস্কারেরও পরিবর্ত্তন হয়,—ব্যক্তিরও হয়, গোষ্ঠীরও হয়! আমি এমন মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি চৌদ্দ পুরুষ শুধু চৌদ্দ কেন, সমস্ত পুরুষ বোধ হয়, যাঁহার ছিল নিরামিষাশী আর নিজেও অর্দ্ধেক জীবন ভরিয়া ছিলেন তাই কিন্তু এখন

হইয়াছেন পরম আমিষভক্ত। জাতির পক্ষেও, ফরাসী জাতিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই সেদিন পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়াছি পরম রাজভক্ত—ফরাসী কেন, পৃথিবীতে এক সময়ে মানুষ মাত্রই বোধ হয় রাজা ছাড়া রাজ্যের কল্পনা করিতে পারিত না, অরাজকতা অর্থ ঘোর বিশৃঙ্খলতা এনার্কিজ্‌ম্—কিন্তু এখন সেই ফরাসীজাতির রাজভক্তি কোথায়, আর মানুষেরও সেই রাজার অভাব অর্থ অরাজকতা এ ধারণা কোথায়? কিন্তু বলা যাইতে পারে এ সব সংস্কার বা অভ্যাস মানুষের খুব গভীর স্তরের জিনিষ নয়, ইহারা ভাসা ভাসা উপরের উপরের, তাই ইহাদের পরিবর্ত্তন সম্ভব। ইহারা যে সনাতন নয়, তাহা আগে হইতেই ধরা যায়; কারণ, কোন না কোন দেশে, কোন না কোন কালে মানবজাতির মধ্যে ইহাদের ব্যভিচার অবশ্যই দেখা যায়। অভ্যাস অর্থাৎ habit or custom এক জিনিষ, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি অর্থাৎ instinct আর এক জিনিষ। প্রথমটির পরিবর্ত্তন হয়, হইতেছে; কিন্তু দ্বিতীয়টির পরিবর্ত্তন কখন হয় না। আমিষপ্রিয়তা, রাজভক্তি, আভিজাত্য-পূজা অথবা আমাদের নানা নৈতিক আদর্শ সবই বিশেষ বিশেষ দেশকালের অভ্যাস ও রীতি; কিন্তু অহমিকা, স্বার্থবোধ,

ব্যক্তিগত বিজিগীষা অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হইতেছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালব্যাপী সনাতন ধর্ম্ম। কোন্ দেশে কোন্ কালে কোন্ সমাজে দেখিয়াছি ইহাদের পরিবর্ত্তে মিলন সামঞ্জস্য একাত্মতা আধ্যাত্মিকতা স্থান পাইয়াছে, নূতন ব্যবস্থা আনিয়া দিয়াছে? এ কথার উত্তর এই, প্রথমতঃ, অভ্যাস আর সহজাত বৃত্তির মধ্যে একটা কাটা-ছাঁটা পার্থক্যরেখা সব সময় টানিয়া দেওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় উহারা দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের জিনিষ নয়, প্রভেদ যাহা তাহা শুধু মাত্রাগত। অভ্যাস বেশী রকম অভ্যস্ত হইলেই আসিয়া দাঁড়ায় সহজাত বৃত্তিতে। অভ্যাসের পত্তন একটা যুগের আরম্ভে আর সহজাতবৃত্তির আরম্ভ বোধ হয় একটা কল্পের আরম্ভে—প্রথমটি মানুষের প্রাণে কিছু বাহিরের স্তর ছুঁইয়াছে, দ্বিতীয়টি আরও একটু ভিতরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু দুইটির কোনটিই যে মানুষের নিবিড়তম সত্তার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ এমন বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, আমরা যাহাকে অন্তরাত্মার ধর্ম্ম বলিয়াছি, তাহা প্রত্যেক মানুষই ভিতরে ভিতরে অথবা ভিতরের সত্য বলিয়া স্বীকার ত করেই, তা ছাড়া বাহিরে সমাজ-প্রতিষ্ঠানে কখন কোথাও তাহার যে

প্রকাশ হয় নাই বা তাহার স্থাপন চেষ্টা হয় নাই, এ কথাও বলা যায় না। ধর্ম্মরাজ্য বা Utopia যে মানুষের কল্পনাতেই আরম্ভ ও শেষ হইয়াছে, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে রাজী নই। আর কোথাও না হউক, অন্ততঃ আমাদের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে, বৌদ্ধসঙ্ঘে, খৃষ্টীয় চার্চ্চে এই রকম একটা শুদ্ধতর গোষ্ঠী-বন্ধনের ইঙ্গিতই কি পাই না? হইতে পারে, এখানে জিনিষটি ছিল সংকীর্ণ, উহার কর্ম্মক্ষেত্র অল্পপরিসর, উহা সমাজকে লইয়া নয়, সমাজের বাহিরে আর একটা সমাজ গড়িবার প্রয়াস আর সেই জন্যই পূর্ণ ফলদায়ক বা বেশী স্থায়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের কথা, মানুষের মধ্যে সংঘর্ষাত্মক সমাজ নহে, মিলনাত্মক সমাজ গড়িবার প্রেরণাও একটা স্বভাব, দ্বন্দ্বই মানুষের স্বভাবের শেষ বা সম্পূর্ণ তথ্য নহে।

সন্ন্যাসীরা সমাজের বাহিরে এক রকম দেব-সমাজ গড়িতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যদি সমাজের ভিতরে ঐ দেব-সমাজ গড়িতে চেষ্টা করিতেন, তবে বোধ হয় আরও বেশী সফল হইতেন। দেব বা আধ্যাত্মিক সমাজকে গড়িয়া যদি উঠিতে হয় তবে দরকার দুইটি জিনিষ, দুইটি দিক হইতে যুগপৎ দুইটি

শক্তির প্রয়োগ বা খেলা। প্রথমতঃ, ভিতরের দিক, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যষ্টির মধ্যে চাই একটা শুদ্ধি, মনকে প্রাণকে নূতন শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠায় ভরপূর করিয়া তোলা, একটা দেবভাবের আবির্ভাব, আত্মার প্রকাশ। দ্বিতীয়তঃ, বাহিরের দিক অর্থাৎ ভিতরের ভাবটিকে জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে ফলাইয়া ধরিবার জন্য সুযোগ সুবিধা অবকাশ রচনা করিয়া দেওয়া, প্রতিষ্ঠান সকলকে নূতন ভাবের উপযোগী নূতন ছাঁচে ঢালাই করিতে থাকা। আমাদের সন্ন্যাসীরা প্রথমটির উপর সব জোর দিয়াছিলেন, দ্বিতীয়টির উপর নজর দেন নাই, তাই সমাজ-প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন, ভিতরের ভাবটিও সেই সঙ্গে তাঁহাদের অতি সঙ্কুচিত হইয়া মলিন ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে। আর আধুনিক কালে সোসিয়ালিষ্ট ও বোলশেভিকগণ জোর দিতেছেন বাহিরের কাঠামটির উপর, এই জন্য তাঁহারাও সম্পূর্ণ সফল যে হইবেন এমন মনে হয় না।

আমরা ভিতরের দিকের কথাটা আপাততঃ বলিব না। বাহিরের দিকের সম্বন্ধেই কিছু বলিতে চাই। ভিতরটা তৈয়ারী হয় ভিতরের জোরে, আত্মগত সাধনায়, এ কথা সত্য হইলেও বাহিরের বিধানও যে এই ভিতরের

সাধনায় সহায়, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। বাহিরের সুযোগ ও সুবিধা, ভিতরের আত্ম-প্রকাশের সুযোগ ও সুবিধা আনিয়া দেয়। বিশেষতঃ যখন একটা গোষ্ঠী বা সমষ্টির নূতন দিক-নির্ণয়, স্বভাবের পরিবর্ত্তন চাই তখন বাহিরের ব্যবস্থার প্রয়োজন আরও বেশী হইয়া পড়ে। সুব্যবস্থা সহজেই সুপ্ত আত্মাকে, মানুষের আপাততঃ কল্পনাগত আদর্শকে, ভিতরের নিবিড়তম ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, ধারা খুলিয়া দেয়, অন্ততঃ সম্ভাবনার মাত্রাকে বাড়াইয়া দেয়। অন্যপক্ষে কুব্যবস্থা ভিতরের ভাবকে চাপিয়া রাখে, নিস্তেজ করিয়া ফেলে—অনেক সময়ে দেখা যায়, ভাব ভিতরে পাকা হইলেও বাহিরের দুর্ব্যবস্থার কঠিন আবরণ একটা তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রকাশ হইতে দিতেছে না। বলা যাইতে পারে অবশ্য, ভিতরটা ঠিক হইয়া আসিলে বাহিরটা আজ না হউক কাল নিশ্চয়ই ঠিক হইয়া আসিবে, তাহা যদি না হয় তবে বুঝিতে হইবে ভিতরটা এখনও ঠিক হয় নাই। কিন্তু আমরা বলি, ভিতর ও বাহির এ রকম ছাড়াছাড়ি নয়—ভিতর বাহিরকে সৃষ্টি করিয়া আনিতেছে যেমন সত্য কথা, সেই রকম বাহিরও ভিতরকে প্রকাশ করিয়া

আনিতেছে সত্য কথা—বিশেষতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা বলিতেছি ব্যক্তিগত সাধনার কথা নয়, কিন্তু সমষ্টিগত সাধনার কথা। মানুষের স্বভাব যেমন সমাজ-প্রতিষ্ঠানের রূপ দিয়াছে, তেমনই এই সমাজ-প্রতিষ্ঠানের রূপই সেই স্বভাবকে গড়িয়া না তুলুক অন্ততঃ বজায় রাখিয়াছে। বোলশেভিকগণ বলেন, মানুষের চিরন্তন স্বভাব বলিয়া কিছু নাই, মানুষের স্বভাব হইতেছে অভ্যাসের ফল, এক রকম সমাজে এক রকম ব্যবস্থার মধ্যে থাকিতে থাকিতে মানুষের এক স্বভাব হইয়াছে, সেই সমাজ সেই ব্যবস্থা উল্টাইয়া দাও, সে আবার নূতন সমাজে নূতন ব্যবস্থায় থাকিতে থাকিতে নূতন অভ্যাস নূতন স্বভাব আহরণ করিবে। এ কথা আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না—কিন্তু ইহা যে আংশিকভাবে সত্য তাহা বিশ্বাস করি।

ব্যক্তিগত অহংস্বাতন্ত্র্য, প্রতিযোগিতা, সংঘর্ষ কতখানি মানুষের অন্তরের প্রকৃতি, সনাতন স্বভাব—আদিম সত্তাগত পাপের (Original sin) ফল, আর কতখানি বাহিরের চাপ প্রয়োজনের তাড়না, গতানুগতিক—অনুসরণেচ্ছার ফল তাহাও দেখিবার বিষয়। ক্ষেত্রজ্ঞ চাই অর্থাৎ যিনি আত্মাকে, নিজের গভীরতম উচ্চতম

সত্তাকে চিনিয়াছেন, ধরিয়াছেন, সেখানে পাইয়াছেন অটুট শান্তি, বিশ্বের সহিত সম্মিলন সামঞ্জস্য; কিন্তু সেই অনুরূপ ক্ষেত্রকেও চাই, পরে নয়, একই সাথে—সমুচিত ক্ষেত্রই অনেক সময়ে ক্ষেত্রজ্ঞকে সচেতন করিয়া তোলে, প্রকৃতির দাবীই অনেক সময়ে পুরুষকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলে।

আধুনিক যে সমাজ-ব্যবস্থা সেখানে নিজেকে আত্মাকে চিনিবার সুযোগ মানুষ পায় না। তুমি আমি যে জীবন চালাই যে কর্ম্ম করি তাহা ভিতরের সত্তার সম্পূর্ণ অনুমোদন পায় না, তাহা ভিতরের আর একটা প্রেরণা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, এ যেন দশচক্রে পড়িয়া ভগবানের ভূত হইয়া যাওয়া। আমার ভিতরের আনন্দ অনুসারে আমার জীবন-প্রতিষ্ঠান আমার কর্ম্মজগৎ রচিত হইতেছে না, জীবনের কর্ম্মের একটা ধরা-বাঁধা কঠিন নিরেট ছাঁচের মধ্যে আমাকে ঢালাই হইতে হইতেছে, যাহা কিছু আনন্দ এই রকমে জোর করিয়া পিষিয়া তবে যেন বাহির করিতে হইতেছে। সমাজ-আয়তনে কয়েকটি মাত্র বড় বড় রাস্তা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, চলিতে ফিরিতে হইলে সকলকেই সেই কয়েকটিকে আশ্রয় করিতে হইবে। জীবনযাত্রার জন্য কয়েকটি জিনিষকে প্রয়োজনীয় বলিয়া

নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা কিছু সে সকলকে অপ্রয়োজনীয় বোধে একপাশে হয়ত আবর্জ্জনারাশির মধ্যে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেককে তাই আপন আপন বহু অঙ্গ অকাজের বলিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে হইতেছে, সকলকে একই রকম ছাঁচের মধ্যে ঢুকিতে হইতেছে; পথের প্রাচুর্য্য নাই, প্রত্যেকের ধরণ-ধারণও এক রকমের হইয়া পড়িয়াছে, ফল যে হইবে সংঘর্ষ অহংমত্ততা তাহা আর আশ্চর্য্য কি ?

আমি কবি-প্রাণ, কিন্তু আমাকে হইতে হইতেছে দর্শনের শিক্ষক অথবা সংবাদপত্রের সম্পাদক। আমার আছে চিন্তাশক্তি, কিন্তু আমাকে করিতে হইতেছে কেরাণীগিরি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমি প্রতিভা দেখাইতে পারি, আমাকে হইতে হইতেছে উকিল। আমি রাজ্য চালাইতে পারি, কিন্তু খাটাইতেছি কুলি। এই রকম একটা ভীষণ বর্ণসঙ্কর আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকিয়াছে। নিজের ভিতরের দিকে তাকাইবার কাহারও অবসর নাই, নিজের আনন্দ কোথায় ও কিসে, নিজের সহজ ধর্ম্ম কি, অন্তরাত্মার গতি ও প্রেরণা কোন্ দিকে তাহা দেখিবার বুঝিবার ফাঁক কোথাও পাই না, একটা ব্যস্ততার স্ত্রস্ততার ধূম ও কুহেলিকা নিশ্বাস

প্রশ্বাসের সব রন্ধ্র যেন বন্ধ করিয়া দিয়াছে, চারিদিকে তাহারই একটা নিবিড় নিরেট যবনিকা ঘিরিয়া রহিয়াছে। আপন আনন্দ আপন ধর্ম্ম বুঝি না, সম্মুখে যাহা পাইতেছি, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই একটা বিপুল ঘূর্ণীবায়ুর পাকে পাকে আপনহারা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছি। স্বধর্ম্ম পাইতেছি না, পাইতে চাহিতেছি না, সকলের ঘাড়ে চাপিয়াছে একটা পরধর্ম্ম, তাই আসিয়াছে নিরানন্দ, সংঘর্ষ। নিজেকে আত্মাকে ধরিয়া জীবন সৃষ্টি করিতেছি না, আনন্দ নয় লাভ, স্বধর্ম্ম নয় স্বার্থই হইয়াছে কর্ম্মের নিয়ন্তা, তাই জীবনে কর্ম্মে ফুটিয়া উঠিয়াছে মিথ্যাচার কৃত্রিমতা ক্ষুদ্রতা ও অসহিষ্ণুতা, দৈন্য ও গৃধ্নুতা।

কিন্তু সমাজের কাঠামকে ছাঁচকে যদি এমনভাবে বদলাইয়া দিতে পারি, যে প্রত্যেকে আপন আনন্দের পথটি অনুসরণ করিবার, নিজের ধর্ম্ম অনুসারে কর্ম্ম করিবার, নিজের অন্তরাত্মাকেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার সুযোগ ও সুবিধা পায়, তবে দেখিব শুধু লাভের স্বার্থের পথে আর কেহ তত সহজে চলিতে চাহিতেছে না। সমাজের গঠন যদি এমন হয় যে তাহা কেবল কয়েকজনের, একটা বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয় পরন্তু নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য, প্রত্যেকের জন্য, সমাজ-ব্যবস্থা যদি এমন উদার হয়

যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমানভাবে আলিঙ্গন করিতে পারে, প্রত্যেক ব্যক্তির দেয়কে এমন কি অলসের আলস্যকে পর্য্যন্ত*—গ্রহণ করিতে পারে, আপন স্থিতি ও পরিপুষ্টির জন্য ব্যবহারে লাগাইতে পারে, তবে দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক হইতে বিভিন্ন, আপন ধর্ম্ম আপন কর্ম্ম রচিয়া প্রত্যেকেই সমাজের ভাণ্ডারে আনিয়া দিতেছে নূতন নূতন সম্পদ্। বর্ত্তমান সমাজে কিন্তু সম্পদ্ কেউ গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না—নূতন ত দূরের কথা, সকলেই যোগাইতেছে ভেজাল; ভেজালে কে কত চালাকী করিতে পারে তাহা লইয়াই চলিয়াছে মারামারি লাঠা-লাঠি। কিন্তু অন্তরাত্মার ধনসৃষ্টিতে সংঘর্ষ নাই, কারণ সেখানে বৈষম্য নাই, সকলেই সেখানে সমান, সকলের সৃষ্টিরই সমান মর্য্যাদা, সমান মূল্য—পরের ধনে সেখানে আমরা ঈর্ষান্বিত নই, কারণ নিজের ধনেই তখন আমরা প্রত্যেকে ধনী।

এ সমাজ-ব্যবস্থা আসিবে কেমন করিয়া, ইহার সম্ভাবনা কোথায়? সমাজ-ব্যবস্থার যুগে যুগে পরিবর্ত্তন

* Cf. Bertrand Russel, "Roads to Freedom"—পৃঃ ১১৪, ১৭৯, ১৮০।

হইয়াছে যে ভাবে, যে হেতুতে, এই নূতন পরিবর্ত্তনও হইবে সেই ভাবে, সেই হেতুতে। বাহিরে প্রাচীন ব্যবস্থার অসম্ভব অসহ্য চাপ আর ভিতরে সমষ্টিগত অন্তরাত্মার একটা নূতন মুক্তির প্রেরণা, ফলে সেই চাপ ও প্রেরণার মাত্রা অনুসারে একটা ওলট-পালট ও নূতন ব্যবস্থার সৃষ্টি। ইহা অসম্ভব নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

এই সমষ্টিগত অন্তরাত্মার উদ্বোধন, এই সমাজগত নূতন ব্যবস্থার পরিকল্পনা হয় বোধ হয় ত প্রথমে কয়েকটি ব্যষ্টির মধ্যে, অগ্রণী যাঁহারা, ভবিষ্যতের প্রতিনিধি যাঁহারা, দৃষ্টি যাঁহাদের মুক্ত, শ্রদ্ধা যাঁহাদের অটুট, সাহস যাঁহাদের দুর্জ্জয়, শক্তি যাঁহাদের অমিত, সাধনা যাঁহাদের অখণ্ড।
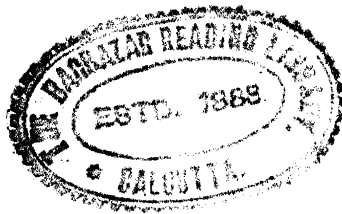
ভাবী-সমাজ

৩

প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আপন আপন অন্তরাত্মার, আপন আপন নিগূঢ় সত্তার চেতনায় ও প্রেরণায় চলে তবে সমাজে আর দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ থাকে না, সমাজে হয় আনন্দেরই সম্মিলিত বহুল-বিচিত্র সমৃদ্ধ স্থষ্টি। কিন্তু এই যে আদর্শ ইহা কি এতই স্পৃহনীয়? দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠা না করিয়া সমাজকে সাম্যের মৈত্রীর একাত্মতার উপর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইলেও, তাহা করা কি উচিত? কথাটি আরও তলাইয়া দেখা দরকার। প্রথমতঃ অন্তরাত্মাকে, নিজের নিজের আসল সত্তা ও ধর্ম্মকে—

নিজত্বকে ধরিতে হইবে। তাহা পারা যায় কিরূপে? দ্বন্দ্বকে সংঘর্ষকে উঠাইয়া দিতে চাই—কিন্তু দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ কি কেবলই আমাদিগকে বাহিরের দিকে টানিয়া লয়, তাহা কি কেবল পরের পথ, পরের ধর্ম্মের উপর আমাদের লোভ বা আক্রমণ-চেষ্টার ফল? বরং ইহাই কি বলা যায় না যে, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষই হইতেছে আত্মচেতনার, নিজত্ব উদ্বোধনের উপায়? পরের দ্বারা প্রতিহত হইয়া, পদে পদে বাধা পাইয়াই ক্রমে আমরা ভিতরে প্রবেশ করিতে শিখি, নিজের পথ নিজের ধর্ম্ম খুঁজিয়া পাতিয়া লইতে বাধ্য হই। আমাদের প্রাণ, আমাদের মন, আমাদের প্রয়োজনের তাড়া বা বাধ্যবাধকতার টান আমাদিগকে বাহিরের দিকে পরধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করে, স্বীকার করিলাম; ফলে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহাও স্বীকার করিলাম। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষই আবার ফিরাইয়া আমাদিগকে ঘরমুখী করিতেছে না কি? অপরের সাথে যুদ্ধ করিতে করিতে, বাধা বিপত্তিকে ঠেলিয়া ভাঙ্গিয়া চলিতে চলিতেই মানুষ আপন আপন শক্তির সামর্থ্যের পরিচয় পায়, অন্তরাত্মাকে প্রবুদ্ধ বিকশিত করিয়া তোলে। যেখানে বাধা বিপত্তি নাই, সকলেই যেখানে স্বেচ্ছামত চলিতে পূর্ণ অবকাশ পাইয়াছে,

সেখানে ত ভিতরের সত্তা ও শক্তি জোর বাঁধিতে পায় না, প্রতিভা খোলে না—তাহা চলে স্তিমিত-প্রবাহে, ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া চলিয়া চলিয়া। সত্যযুগ বা ধর্ম্মরাজ্য শান্তিকে সামঞ্জস্যকে পাইতে পারে, কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মা নূতন নূতন শক্তিতে ভরাট হইয়া উঠিতে পায় না। সুখ ও স্বস্তিই আদর্শ নয়, আদর্শ পূর্ণতর ঋদ্ধতর জীবন। দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বাধা বিপত্তিই ত জীবনের লুক্কায়িত বৈভব ফুটাইয়া ধরে। দ্বন্দ্বেরই মধ্য দিয়া মানুষ নিজেকে পাইতে পাইতে চলিয়াছে, নিজেকে সমর্থ করিয়া তুলিতেছে, নিত্য নূতন জ্ঞানে গরিমায় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিতেছে। এই দ্বন্দ্ব যেখানে নাই সেখানে প্রত্যেকে নিজেকে পাইলে পায় ছোট স্কেলে, অল্পমাত্রায়, অন্তরাত্মায় সেখানে পূর্ণ বিস্তারের টান পড়ে না।

তারপর দ্বন্দ্বের সাথে সাথে আছে বৈষম্য; কিন্তু বৈষম্যকে দূর করিয়া সব একাকার করিবার চেষ্টায় লাভ কি? বৈষম্যেরই জন্য জগতে আছে বৈচিত্র্য। বৈষম্যের কুফল মানুষকে ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার সুফলের অধিকারী ত মানুষই, এ কথা ভুলিলে চলিবে কেন? বৈষম্যের ফলে একদিকে যেমন পাই দীন দরিদ্র অজ্ঞানী অক্ষম, ঠিক অন্য দিকেই

তেমনি পাই শ্রীমান বিভূতিমান জ্ঞানী সক্ষম; একদিকে যেমন আছে অতল গহ্বর, অন্যদিকে তেমনি আছে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ। কেহ কাহারও সমান নয় অর্থাৎ প্রত্যেকেই আপন আপন সত্তা ও শক্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে, আপন আপন প্রতিভাকে খাটাইয়া জীবনে যতখানি বা যতটুকু পারিতেছে সফলতা লাভ করিতেছে—এই ব্যবস্থার প্রসাদেই যে পারিতেছে উপরে উঠিয়া যাইতেছে, আর যে পারিতেছে না সে নীচে থাকিতেছে বা আরও নামিয়া যাইতেছে। যে যেমন অধিকারী তাহার তেমনি কর্ম্মফল—যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন। যুদ্ধে যাহারা হারিয়া যায় তাহাদের জন্য দুঃখ করিয়া লাভ কি, তাহারা হারিবার উপযুক্তই—বিজয়ী যাহারা তাহাদের দিকে ফিরিয়া দেখ, বৈষম্যেরও সার্থকতা বুঝিবে। শান্তি সাম্য চায় কাহারা? যাহারা অশক্ত, যাহাদের নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই, আপন যোগ্যতায় যাহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই—পথের দুর্গমতা যাহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তোলে, যাহারা চায় কেবল সুযোগ সুবিধা সহজ সুকর কিছু। সাম্যবাদের ফলে নীচে যাহারা পতিত তাহাদের লাভ কিছু হইতে পারে, তাহারা যৎকিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু উপরে যাহারা, শ্রেষ্ঠ

যাহারা, তাহাদিগকে নীচে নামিয়া আসিতে হয়, তাহাদিগকে খর্ব্ব করিতে হয় তাহাদের উদাত্ত সামর্থ্য। সাম্যবাদ সমর্থ অপেক্ষা অসমর্থকেই বেশী মূল্য, বেশী মর্য্যাদা দেয়; কিন্তু ইহাতে হৃদয়বত্তা থাকিলেও, মোট জগতকে কি ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হয় না? জগতে বৈষম্য যেখানে যত বেশী, সেখানে নিম্নতম স্তর যেমন পাই, উচ্চতম স্তরও তেমন পাই। নিম্নতমকে না রাখিতে চাও, উচ্চতমকেও তবে রাখিতে পাইবে না। যে সমাজে সকলে সমানভাবে মাঝারি ধরণের তাহাই ভাল, না যে সমাজে একদিকে খুব ছোটও যেমন আছে আবার খুব বড়ও তেমনি আছে তাহাই ভাল?

সংঘর্ষ ও বৈষম্য না থাকিলে, মানুষের অন্তরাত্মা পূর্ণতা পায় না, সমাজে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য বলিয়া কিছু থাকে না। কিন্তু বাস্তবিক তাহাই কি? মানুষে মানুষে সংঘর্ষ মানুষের একটা ব্যক্তিত্ব-বোধকে জাগাইয়া তোলে বটে, কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব তাহার আসল ব্যক্তিত্ব নয়, তাহার অন্তরাত্মা নয়, সেটি হইতেছে অহঙ্কারের বোধ। আর এই অহঙ্কার ত হইতেছে তামসিক অহঙ্কার, প্রাণের অন্ধ আবেগের ক্রিয়া। ফলতঃ, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ যে তামসিক অহঙ্কারকে জাগাইয়া ধরে, তাহা মানুষকে

আপন সত্য অহং—অন্তরাত্মা হইতে দূরেই লইয়া ফেলে, অন্তরাত্মার দূরে বাহিরে প্রয়োজনের বা সংস্কারের একটা খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ঘূর্ণীর মধ্যে মানুষকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তাই আমরা বলিতেছি, অন্তরাত্মার পরিস্ফুরণের জন্য দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ দরকার নাই, দরকার ভিতরে একটা তপঃ-প্রয়োগ, ঠাসাঠাসি রেষারেষি দরকার নাই, দরকার একটা মুক্ত বিস্তীর্ণ অবকাশ।

আর বৈষম্য না থাকিলে যে বৈশিষ্ট্য থাকিবে না, এমনও কোন কথা নাই। মানুষে মানুষে বৈষম্য আছে ও থাকিবে; কিন্তু সে বৈষম্য অর্থ এমন নয় যে, কাহাকেও নীচে আর কাহাকেও উপরে থাকিতে হইবে, উপরে যে থাকিবে সে নীচেকে চাপিয়া থাকিবে! জগতে যে বৈষম্যের খেলা আমরা নিত্য দেখি, সেটি হইতেছে অহঙ্কারের বুভুক্ষার তারতম্য আর কৃত্রিম একটা অবস্থা ও ব্যবস্থা সেই বুভুক্ষার যে সুযোগ ও সুবিধা অথবা যে বাধা ও বিপত্তি আনিয়া দিতেছে তাহারই ফল। অন্তরাত্মায় যে বৈষম্য আছে, তাহা শক্তির বিভিন্ন ভাব মাত্র, ছোট বড় শক্তির রেষারেষি নহে। বাহিরে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে ঈর্ষা ও প্রতি-যোগিতা দেখিতে পাই, তাহা সত্যকার বস্তু নয়, সেটি

ব্যতিরেকী বা অভাবাত্মক (negative) জিনিষ, ভিতরের অন্তরাত্মার বস্তু হইতেছে স্বভাব ও স্বধর্ম্মের প্রবাহ। প্রত্যেকের অন্তরাত্মা এক এক ধরণের শক্তির বিভূতি; নিজস্ব শক্তিকে নিজস্ব ধরণে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিয়াই মানুষ প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে বৈচিত্র্যকে সৃষ্টি করিতে পারে। অন্তরাত্মায় সকলেই এক স্তরে দাঁড়াইয়া, তাই সেখানে সকলেই সমান; তাহার অর্থ নয় যে সব একাকার। আপন আপন অন্তরাত্মার প্রতিভাকে সকলে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, প্রত্যেকের ক্ষেত্র পৃথক্ পৃথক্ —কাহার শক্তি বড় কাহার ছোট, কে উপরে কে নীচে এ প্রশ্ন সেখানে আদৌ উঠে না, তুলনা সেখানে চলে না কারণ সকলেই অন্তরাত্মাকেই পাইয়াছে ও সৃষ্টি করিতেছে। অন্তরাত্মায় পুরুষে বড় ছোট নাই, উপর নীচ নাই, আছে শুধু নানা ভঙ্গী, বিভিন্ন ধরণ, বিচিত্র রঙ্।

দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বৈষম্যের ভিতর দিয়া ছাড়া মানুষ কখন অন্তরাত্মার উদ্বোধন করিতে পারে না, অন্তরাত্মার পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে পারে না—এ কথার অর্থ এই যে, মানুষকে জোর করিয়া না চালাইলে সে চলিতে চাহিবে না। মানুষের কর্ম্ম মানুষের সৃষ্টি হইতেছে কেবল বাহিরের চাপের জোরজবরদস্তির ফলে—আনন্দের

কর্ম্ম আনন্দের সৃষ্টি বলিয়া তাহার কিছু নাই। কিন্তু বেত্রাঘাত করিয়াই শিশুকে শিক্ষা দেওয়া চলে, এ ধারণা যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগে আর কাহারও নাই, সেই রকম জীবনের ক্ষেত্রেও সংঘর্ষ বা জোরজবরদস্তি করিয়াই যে কেবল মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয়, এ কথাও ন্যায়তঃ আর আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। মানুষের সহজ ধর্ম্ম, তাহার নৈসর্গিক প্রেরণাই হইতেছে অন্তরাত্মাকে জাগাইয়া ফুটাইয়া তোলা, তাহার ভিতরের সারবস্তুকে বাহিরে ছড়াইয়া ফলাইয়া ধরা। মানুষের অন্তরতম সত্বার মধ্যেই আছে একটা টান, যাহার ফলে সেই সত্তা আপনা হইতেই আপনাকে বিকশিত করিয়া চলিতে চায়। অন্তরাত্মার পরিস্ফুরণ-প্রয়াস স্বয়ংসিদ্ধ, অন্তরাত্মার আনন্দই এই পরিস্ফুরণে। জোরজবরদস্তির দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের প্রয়োজন যে হইবেই, এমন কোন কথা নাই। এই দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের সুফল যে আমরা সময়ে সময়ে দেখিয়া থাকি, তাহার কারণ অন্য পথ আমাদের চোখে পড়ে নাই, অন্য পথ আছে কি না তাহা জানিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টা বা কৌতূহলও আমাদের তেমন হয় নাই। তাহা যদি হইত তবে বুঝিতাম, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ খুব ভাল হিসাবে ধরিলেও হইতেছে বড় জোর

মন্দের ভাল (second best thing); আসলে কিন্তু দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ কিছু দূর উঠাইয়া ধরিলেও একেবারে চরমে, অন্তরাত্মার মধ্যে আমাদিগকে কখন পৌঁছাইয়া দিতে পারে না—প্রথমে সহায় হইলেও পরে তাহা বাধাই হইয়া দাঁড়ায়, অন্তরাত্মার সম্মুখে একটা যবনিকাই সে খাড়া করিয়া দেয়।

মানুষ যদি কেবল পশুই হইত তবেই বোধ হয় সংঘর্ষের লগুড়াঘাতে সে উপকার পাইত। কিন্তু মানুষের মধ্যে স্পষ্টই দেখিতে পাই, জাগিয়াছে একটা আত্মসংবিৎ —এই আত্ম-সংবিৎ নিজের শক্তিতেই শক্তিমান্, নিজের আনন্দের জোরেই নিজের পূর্ণ সার্থকতার দিকে চলিতে পারে ও চলিতে চাহে। দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ এই আনন্দকে দীর্ণ করিয়া দেয়, ঐ শক্তিকে ছিন্ন করিয়া ফেলে। মানুষের অন্তরাত্মা নিজের সামর্থ্যেই সমর্থ—রাস্তা যদি পরিষ্কার থাকে, ক্ষেত্র যদি উদার বিস্তৃত হয়, তবে নিজের বেগেই সে নিজে চলিতে পারে, আপন প্রতিভাতেই আপনার চরম সৃষ্টি করিতে পারে।

জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, মানুষ যদি এতখানি স্বয়ংসিদ্ধ, তাহার অন্তরাত্মা যদি এত সমর্থ, তাহার আনন্দ যদি এত বলীয়ান, তবে বাহিরের সংঘর্ষে কি আসে যায়?

সংঘর্ষ বা সাম্যমৈত্রী দুই-ই তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর, উভয়েরই অতীত সে। ফলতঃ দেখি না কি, শক্তিমান্ যে, প্রতিভাশালী যে, সর্ব্বাবস্থায় সে আপনার পথ করিয়া লইয়াছে—সুযোগ বা দুর্য্যোগ, অনুকূল বা প্রতিকূল কিছুরই সে তোয়াক্কা রাখে না, শান্তি বা সমর দুই-ই তাহার প্রতিভাকে উপচিতই করিয়া চলিয়াছে? বরং এই কথাই কি বলা যায় না যে, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ প্রতিকূল অবস্থাই হইতেছে অন্তারাত্মার শক্তির বা আনন্দের কষ্টিপাথর? সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে জয় করিয়া অতিক্রম করিয়া টিকিয়া আছে যে, সেই শক্তি সেই আনন্দই খাঁটি, তাহারই বর্ত্তিয়া থাকিবার অধিকার আছে? দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ সহায় না হউক, বাধা হিসাবেও ইহাদের সার্থকতা আছে, কারণ বাধা দিয়া ইহারা অন্তরাত্মার শক্তির সামর্থ্যের আনন্দের মূল্য যাচাই করিয়া দিতেছে।

এ কথা সত্য, আপাততঃ আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম। মানুষ যতদিন অন্তরাত্মার স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, ততদিন না হয় সংঘর্ষের বৈষম্যের একটা প্রয়োজন থাকিল, কারণ ততদিন মানুষ পশুভাব হইতে একান্ত মুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সংঘর্ষ ও বৈষম্যকে যদি চিরন্তন করিয়া রাখিতে চাই

তবে উহাদের যে প্রয়োজন ঠিক তাহাই ব্যর্থ হইবে। সংঘর্ষ ও বৈষম্যের লক্ষ্য যাহাতে হয় সংঘর্ষ ও বৈষম্যকে ছাড়াইয়া সম্মিলন ও সাম্যের মধ্যে পৌছান, বাহিরের প্রতিযোগিতা যাহাতে আমাদিগকে লইয়া চলে অন্তরাত্মার সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে, পশুভাব পশুত্বকে অতিক্রম করিয়া যাহাতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে একটা দেবভাবে, সে রকম মনের অবস্থা ও সমাজের ব্যবস্থা যদি না তৈয়ার হইতে থাকে তবে ঐ সব উপায়ের আশ্রয়ের পূর্ণ সার্থকতা নাই।

কিন্তু তাহা কি কখন হয়? সংঘর্ষ কি কখন আপনা-আপনি সম্মিলনে, প্রতিযোগিতা একাত্মতায়, পশুভাব দেবত্বে পরিণত হইতে পারে? এ যেন যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধ নিরসন করিবার প্রয়াস (The war that will end war). কিন্তু আজ কি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, এ স্বপ্ন আমাদের কত অমূলক—যুদ্ধ কেবল যে যুদ্ধেরই বীজ বপন করে? ভোগের দ্বারা ভোগের উপশম হয় না, বরং তাহা বাড়িয়াই চলে। সংঘর্ষ বা প্রতিযোগিতা মানুষের মধ্যে যে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, সেটা হইতেছে পশুর শক্তি, বড়জোর আসুরিক শক্তি। জোরজবরদস্তিতে যে শক্তি বল পায়, পাকা হয়, তাহা আত্মার বল নয়, সেটা হইতেছে মনের প্রাণের মধ্যে জড়াইয়া আছে

যে অহঙ্কারের মাৎসর্য্য, দাম্ভিকতা। সংঘর্ষ প্রতিযোগিতা জোরজবরদস্তি অহঙ্কারেরই খোরাক জোগায়, অহ-ঙ্কারকেই সঞ্জীবিত জীবন্ত শক্তিমান করিয়া তোলে। আবার অহঙ্কারকেও কেবল অহঙ্কারের উপর ভর করাইয়া অন্তরাত্মায় পৌঁছান যায় না, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের ভিতর দিয়া অহঙ্কারকে অন্তরাত্মার চেতনায় রূপান্তরিত করা যায় না।

তারপর প্রতিভাবান্‌দের কথা। আমরা দেখিতে পাই কোন দ্বন্দ্বের মধ্যে সংঘর্ষের মধ্যে—তাহা বাহিরের হউক, আর এমন কি ভিতরেরই হউক—যে প্রতিভা লালিত পালিত পরিপুষ্ট তাহার সৃষ্টিতে, তাহার ধর্ম্মে কর্ম্মে লাগিয়া আছে সেই দ্বন্দ্বের সংঘর্ষেরই একটা ছায়া, তাহাতে অন্তরাত্মার পূর্ণতা ধরা দিতে পারে নাই, সেখানে মিশিয়া আছে নীচের স্তরের, অহঙ্কারেরই একটা রেশ। নীট্‌শের মধ্যে দেখিতে পাই যে একটা অতৃপ্তি একটা চাঞ্চল্য একটা দুঃখ, তাহার কারণ কতকটা বটে জগতের মানুষের বাস্তব অবস্থা আর তাঁহার আদর্শোচিত জগৎ ও মানুষ এই দুইএর মধ্যে বিপুল পার্থক্যের অনুভূতি—কিন্তু আসল কারণ তাঁহার ভিতরে সেই আদর্শেরই মধ্যে। নীট্‌শের অন্তরাত্মায় ছিল

একটা আদর্শ একটা উপলব্ধি কিন্তু তাঁহার মনের প্রাণের উপলব্ধি আদর্শ সেই অন্তরাত্মার উপলব্ধি আদর্শকে সম্যক্ প্রকাশিত হইতে দেয় নাই, তাহাকে বিকৃত করিয়া ধরিয়াছে; তাই সেই অন্তরের অতৃপ্তিই শত ভাবে ভঙ্গিমায় মনে প্রাণেও ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। নেপোলিয়নের অন্তরাত্মাও নেপোলিয়নের কর্ম্মে পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারে নাই (প্রমাণ তাঁহার নিজেরই অনেক কথা, বিশেষতঃ তাঁহার বন্দী-অবস্থার জীবন কাহিনী); নেপোলিয়নের জীবন—অন্ততঃ নেপোলিয়নের দিক হইতে—যে একটা ট্রাজেডি, তাহার কারণ আমরা বলিব এই যে তিনি সজ্ঞানে পূর্ণভাবে অন্তরাত্মার স্তরে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই, অন্তরাত্মার মুক্ত জাগ্রত প্রেরণার কর্ম্ম করেন নাই, তিনি দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের উপরে উঠিয়া দ্বন্দ্বকে সংঘর্ষকে চালান নাই, তিনি অন্তরাত্মাকে মনের প্রাণের মধ্যে নামাইয়া দিয়া, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যে থাকিয়া তবে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ করিয়াছেন, কর্ম্ম করিয়াছেন।* বায়রণ অথবা গ্যেটে অপেক্ষাও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মধ্যে যে পাই একটা উচ্চতর উদারতর নিবিড়তর কবিদৃষ্টি, তাহার কারণ

* অন্তরাত্মা হইতে উৎসরিত কর্ম্মের কর্ম্মী যে কিরূপ তাহার কিছু নিদর্শন পাই বুদ্ধে, তাহার পূর্ণ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যে থাকিয়া বাধাকে বিপত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি তাঁহার প্রতিভায় জগৎকে সৃষ্টি করেন নাই, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরাত্মায় উঠিয়া গিয়া অন্তরাত্মার স্বতঃসিদ্ধ সহজ প্রেরণার বলে ; আর বায়রণ বা গ্যেটে নেপোলিয়ানেরই মত দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের স্তরে দাঁড়াইয়া অন্তরাত্মাকে একটা পর্দ্দার আড়ালে—সে পর্দ্দা যতই সূক্ষ্ম বা পাতলা হউক না কেন, পর্দ্দার আড়ালে ফেলিয়া রাখিয়াছেন—গ্যেটের মধ্যে ছিল চিন্তা-জগতের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, বায়রণের ছিল প্রাণ-জগতের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ। বাস্তবিক পক্ষে, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ যে প্রতিভাবান্‌দের প্রতিভাকে ইন্ধন যোগাইয়া প্রজ্জলিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা নয় অথবা বাধা দিয়া তাহার দাম কষিয়া দিতেছে এমনও নয়। প্রতিভাবান্‌দের প্রতিভার ইন্ধন প্রতিভারই ভিতরে, প্রতিভার কষ্টি-পাথর প্রতিভা স্বয়ং।

দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হইতেছে মনের প্রাণের শরীরের ক্ষেত্রে—কিন্তু প্রতিভার উৎস যেখানে সেই অন্তরাত্মার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ নাই। অন্তরাত্মায় যতদিন উঠিতে পারিতেছি না, ততদিন অন্তরাত্মার যে স্বতঃস্ফূর্ত্তি স্বয়ংসিদ্ধ প্রেরণা তাহাই মনে প্রাণে শরীরে প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার

চাপের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইতেছে। এই চাপ দূরীভূত হইলে ভিতরের প্রেরণাও যে সেই সঙ্গে বন্ধ হইয়া যাইবে তাহা নয়, বরং সেই প্রেরণা মুক্তপথে স্বরূপে স্বভাবে ফুটিয়া উঠিবে, মনে প্রাণে দেহে সঞ্চারিত হইবে। বিরুদ্ধ শক্তির উপর ভর করিয়া দাঁড়ায় অহঙ্কারের শক্তি, অহঙ্কারই চায় আপন প্রতিষ্ঠার জন্য বিরুদ্ধ শক্তি; কিন্তু অন্তরাত্মার তাহা প্রয়োজন হয় না, অন্তরাত্মার শক্তি হইতেছে নিজের আনন্দের তপঃসৃষ্টি। অহঙ্কার লুপ্ত হইলে অন্তরাত্মার বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় না, বরং আপন প্রকৃত বৈশিষ্ট্য, উদার স্বাতন্ত্র্যেই ভরাট হইয়া অন্তরাত্মার প্রতিভা তখন প্রবাহিত হইতে পারে।

দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের উপর—প্রতিযোগিতার উপর সমাজ যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মনে রাখিতে হইবে, সেটি একটি অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা মাত্র, বিবর্ত্তনের একটা বিশেষ স্তরের সত্য। অন্তরাত্মার কোন ইঙ্গিতই যতদিন মানুষের মধ্যে দেখা দেয় নাই, মানুষ যতদিন শুধুই মনের বাদ-বিচার, প্রাণের অন্ধ আবেগ আর শরীরের আশু-প্রয়োজনের তাড়নায় চলিতেছে ফিরিতেছে, মানুষের 'আমি'র সীমা যতদিন এই ভোগায়তনের পরিসরটুকু অর্থাৎ মানুষ যতদিন পশু হইতে খুব বেশী বিভিন্ন নয়,

ততদিন সমাজের মাৎস্য-ন্যায়-ব্যবস্থার প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে। মানুষ যাহাতে জড় মৃত না হইয়া পড়ে, যাহাতে তাহার মধ্যে থাকে একটা প্রাণের স্পন্দন জীবনের আবেগ সেই জন্য দরকার একটা বুভুক্ষা, একটা আত্মাভিমান—গ্যেটের মতে, শয়তানের অঙ্কুশাঘাত। আত্মার বা অন্তরাত্মার জ্ঞান ও অনুভূতি মানুষের যখন নাই, তখন অহংএর এই ছোট আত্মাটি ভাল করিয়া চিনিতে হইবে, বুঝিতে হইবে—তাহার শক্তির ও আসক্তির সকল দিক সকল সীমা দেখিয়া শুনিয়া লইতে হইবে। এই রকমেই অবিদ্যাকে সে কেন্দ্রীভূত করিয়া লইতেছে, সকল ছড়ান লুকান আঁধারকে একত্রিত করিয়া ধরিতেছে, কিন্তু পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে পরবর্ত্তী পদবিন্যাসে বিদ্যার মধ্যে আলোকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য—উপর দিকে ভোরের আলো যত কাছে আসিতেছে, এক সময়ে ততই না নীচের দিকে রাত্রির অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছে, দেখা যায়?

কিন্তু অন্তরাত্মা যখন জাগিয়াছে, মানুষ অহঙ্কারের উপরে মন প্রাণ দেহের উর্দ্ধে তাহার গভীরতম সত্তার সন্ধান পাইয়াছে—উষার প্রথম রশ্মিটুকু যখন দেখা দিয়াছে—তখনও যদি সেই পূর্ব্বব্যবস্থা অনুসারেই সে

চলিতে থাকে, তবে সেটা হইবে তাহার অধর্ম্ম, অভ্যাসের সংস্কারের জের মাত্র; তখন তাহার ধর্ম্ম গতানুগতিকের কাঠামকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, নূতন প্রাণবন্ত ব্যবস্থার সংস্থাপন—সবিতা যখন উদিত, তখন সবিতারই ধর্ম্মে আমাদের কর্ম্মকে গড়িয়া সাজাইয়া উঠাইতে হইবে।

যদি জিজ্ঞাসা কর, অন্তরাত্মা জাগিয়া থাকিলে অন্তরাত্মাই ত আপন ইচ্ছামত আবশ্যকমত সব সৃষ্টি করিয়া লইবে, তবে আমাদের এ সব চেষ্টার প্রয়োজন কি, মূল্য কি, আমাদের এ সব ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পণ্ডশ্রম মাত্র নয় কি? এ কথার উত্তরে আমরা এখানে শুধু এইটুকু বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইব যে আমাদের এই সব চেষ্টা এই সব শ্রম অন্তরাত্মারই প্রেরণার বিভিন্ন রূপ, অন্তরাত্মারই আপন কর্ম্মের প্রণালীর অন্তর্গত।

মানবজাতির অন্তরাত্মা জাগিয়াছে কি না, মানুষ প্রাচীন পরিচিত অভ্যস্ত সমাজ-ব্যবস্থাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবার মত প্রস্তুত হইয়াছে কি না, অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠানের অধিবাসী হইবার অধিকারী সে হইয়াছে কি না—এ প্রশ্নের মীমাংসা বিচারে সম্ভব নয়, ইহার মীমাংসা একমাত্র—ফলেন পরিচীয়তে। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে বৃথা প্রমাণ সাজাইবার যত্ন হইতে আমরা বিরত হইলাম।

ভাবী-সমাজ

৪

মারামারি কাটাকাটির ভিতর দিয়া বাড়িয়া উঠিলে মানুষের শক্তি প্রতিভা ব্যক্তিত্ব বাড়িয়া উঠে এ কথা স্বীকার করিলেও, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ যে সমাজের এই একই রকম বিধি-ব্যবস্থার সহায়ে হয়, এমনও জোর করিয়া বলা যায় না। মূর্খের লাঠ্যৌষধি—কিন্তু লাঠিতে মূর্খের পিঠের দাঁড়া শক্ত হইতে পারে, তাহার জ্ঞানের চক্ষু ফোটে কি না সন্দেহ; গাধাকে পিটিয়া ভার বহনের শিক্ষা তাহার আয়ত্তে আনিয়া দিতে পার, কিন্তু মানুষ করিতে পার না; কামড়াকামড়িতে দন্ত-নখরের

সামর্থ্য বাড়াইতে পার, কিন্তু তাহাতে যত সামর্থ্য ঐ দন্ত-নখরেই জমা হয়, ভিতরের সামর্থ্য সব চাপা পড়িয়া যায়। সে যাহা হউক, সমাজে রেষারেষি তাড়াহুড়া জোরজবরদস্তির ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে যদি আনা যায় আর এক ধরণের ব্যবস্থা, যেখানে মানুষ পায় একটা বিস্তীর্ণ অবকাশ, ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতে পারে খুব সহজে স্বচ্ছন্দ গতিতে, কেহ কাহারও সাথে টক্কর না খাইয়া, তবে ফলে দাঁড়ায় কি? আপাততঃ মনে হয়, মানুষ শক্তি ও উদ্যম হারাইয়া ক্রমে হইয়া পড়িবে অলস, সৌখীন, মেরুদণ্ডহীন, অবলা-স্বভাব। ওয়েল্স্ সাহেব দূর ভবিষ্যৎ মানবজাতির এই রকম একটা পরিণাম কল্পনায় চিত্রিত করিয়াছেন—মানুষ সব ছোট ছোট, দাড়িগোঁফ-শূন্য, পুরুষ কি মেয়ে চেনা দায়, শরীরে বল নাই, বুদ্ধির প্রাখর্য্য নাই, ইন্দ্রিয়ের তেজ নাই, সৃষ্টির ক্ষমতা নাই, আছে শুধু বালকের কৌতূহল, সহজ সরল অনুভূতি, প্রকৃতির কোলে হাওয়ায় হাওয়ায় যেন সকলে উড়িয়া বেড়াইতেছে।* কিন্তু এইরূপ হইতে কি বাধ্য? এ রকমও ত ঘটিতে পারে যে মানুষ অটুট শান্তিপূর্ণ অবকাশ পাইয়া, করিতেছে বিশুদ্ধ আনন্দের সৃষ্টি, বাহিরের সকল চাপ হইতে মুক্তি

* H. G. Wells—The Time Machine.

তাহাদিগকে লইয়া চলিয়াছে আপন আপন অন্তরাত্মার সন্ধানে, আপন আপন নিগূঢ় প্রতিভার পরিস্ফুরণে। চাপ ছাড়া শক্তি ফোটে না, ঘর্ষণ ছাড়া আলো ও উত্তাপ বাহির হয় না, এ কথা যখন বলা হয় তখন ধরিয়া লওয়া হয় যে জিনিষের এমন কোন অবস্থা নাই বা হইতে পারে না যখন সে সহজ অবস্থায় থাকিয়া আপনা হইতেই শক্তি আলো উত্তাপ বিকীরণ করে। কিন্তু আজকালকার Radio activityর ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া এ কথা ত কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। মানুষ কর্ম্ম করে যে কেবল প্রয়োজনের বশে, অভাবের তাড়নায়—ইহা স্থূল দৃষ্টির কথা। আসল ভিতরকার সত্য হইতেছে মানুষ কর্ম্ম করে আনন্দের প্রেরণায়, ভাবেরই খেলার জন্য! ব্যবহারিক হিসাবে দেখা যায় বটে যে সব কর্ম্ম কোন প্রয়োজনের রসদ জোগাইতেছে, কোন অভাব মিটাইতেছে; কিন্তু আসলে কর্ম্ম কর্ম্মেরই জন্য, কর্ম্মের আনন্দের জন্য। চাষী চাষ করিতেছে, বাণিয়া ব্যবসা করিতেছে লাভের জন্য বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় কারণ নয় কি, চাষে ব্যবসায়ে যে আনন্দ তার জন্য? কবি কবিতা রচনা করিতেছেন লোকের উপকারের জন্য বা যশের জন্য, এটা গৌণ কারণ; আসল কারণ, কবিতা

রচনা করা তাঁহার স্বধর্ম্ম, না করিয়া তিনি পারেন না, বাহিরের কোন উদ্দেশ্য কোন লক্ষ্য কোন অভাব বোধ না থাকিলেও, তিনি উহাই করিয়া যাইতেন।

মানুষের রজোগুণ তাহার সত্ত্ব বা সত্তার সহিত ওতঃপ্রোতঃ মিশ্রিত। দ্বন্দ্ব (struggle) এই রজোগুণের একটা প্রকরণ মাত্র—শুধু প্রাণময় ক্ষেত্রে (vital plane) রজোগুণের যে খেলা আবদ্ধ সেখানেই সম্ভব দ্বন্দ্ব; কিন্তু বিশুদ্ধ সত্তা, আত্মা, অন্তরাত্মায় আছে যে রজোগুণের খেলা তাহা দ্বন্দ্ব নয়, তাহা হইতেছে প্রকাশ, প্রকাশের গতি। এই বিশুদ্ধ রজোগুণ প্রাণেও নামিয়া আসিতে পারে, প্রাণকে তদনুরূপ ধর্ম্মে লীলায়িত করিয়া তুলিতে পারে। প্রাণশক্তি যখন একটা অভাব বা শূন্যতাবোধ দিয়াই পরিচালিত হয় না, সে যখন চলে আপনার পূর্ণতার জন্যই উছলিয়া দুই কূল ছাপাইয়া, তখন প্রাণে প্রাণে আর দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতা ধ্বস্তাধ্বস্তি কামড়াকামড়ি বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। তখন প্রত্যেকে চলে আপন আপন স্বভাবের স্বধর্ম্মের পথে আপন আপন বিশেষত্বকে ফলাইয়া ধরিবার জন্য; প্রত্যেকের কর্ম্ম প্রত্যেকের কর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য নয়, কাহারও সত্তা কাহারও সত্তাকে খর্ব্ব করিয়া চলিবার জন্য নয়,

কিন্তু সকলেই আছে আপন আপন সিদ্ধি ও ঋদ্ধিকে প্রকট করিবার জন্য, আর সেই উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সফল হয় অপর সকলের সিদ্ধি ও ঋদ্ধিকে উপচিত করিয়া চলিয়া।

ফলতঃ, এই কথাটি স্মরণে রাখিতে হইবে যে জীবনের মূল বাসনা নয়, জীবনের মূল হইতেছে আনন্দ। বাসনা যদি নাও থাকে তবুও জীবন লোপ পাইবে না; বাসনার নীচে আছে যে আনন্দের ইষণা, সৎপুরুষের তপঃশক্তি, তাহাই জীবনকে সঞ্জীবিত প্রস্ফুটিত করিয়া ধরিবে। বাসনা হইতে কর্ম্ম উদ্ভূত নয়, কর্ম্ম উদ্ভূত সত্তার আদি প্রকৃতি হইতে, বাসনা এই আদি প্রকৃতির একটা পরিণতি বা বিকৃতি মাত্র। সংঘর্ষ হইতেছে বাসনার জগতের কথা। কর্ম্মকে বাসনার সহিত মিশাইয়া ফেলা হইতেছে, তাই ত আমরা মনে করি সংঘর্ষ ছাড়া কর্ম্ম নাই। গীতার মূল কথাটিই ত এইখানে।

কর্ম্ম হইবে অথচ সংঘর্ষ হইবে না, এই ভাবটি ধারণা করিতে আমাদের খুবই কষ্ট হয়, আমাদের বুদ্ধির কাছে এটা একটা অসম্ভব জিনিষ বলিয়াই বোধ হয়। কর্ম্ম মানেই শক্তি-বিকীরণ অর্থাৎ নানাশক্তির ছুটাছুটি অর্থাৎ ধাক্কাধাক্কি অর্থাৎ সংঘর্ষ। অবশ্য এমন কল্পনা করা

যাইতে পারে যে শক্তিকণাগুলি ছুটিতেছে টানা সরল রেখায়, নানা মুখে নয়—শক্তির ধারা সব চলিয়াছে সমান্তরাল রেখায় সোজাসুজি (এক দিকেই হউক আর বিপরীত দিকেই হউক); এরূপ কল্পনা করিলে সংঘর্ষকে বাতিল করা যাইলেও যাইতে পারে, কিন্তু এটা কল্পনা-মাত্র—অণু পরমাণুর সংঘর্ষ ছাড়া জগৎ নাই, Radio active বস্তুতে বাহিরের সংঘর্ষ দিয়া আলো উত্তাপ জাগাইতে হয় না বটে কিন্তু তাহার ভিতরে অণু পরমাণুর মধ্যে যে কি ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব বিপুল সংঘর্ষ চলিতেছে তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সংঘর্ষ যে কেবল প্রাণ-জগতের সত্য (biological truth) তাহা নয়, ইহা সত্তামাত্রেরই সত্য (truth of existence).

কথাটা মানিয়া লইলাম, কারণ না মানিয়া উপায় নাই। তবুও আরও কথা আছে। জড়ের ক্ষেত্রে, প্রাণের ক্ষেত্রে যেটা সত্য মানুষের মধ্যে সেই সত্যটাই পায় একটা নূতন ব্যঞ্জনা, একটা রূপান্তর। কারণ মানুষের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে আরও একটা ক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রের সত্য। মানুষ শুধু জড় সমষ্টি নয়, অথবা প্রাণশক্তির ঘূর্ণীপাক নয়, মানুষ হইতেছে চিন্ময় সত্তা,

মানুষের মধ্যে আছে আত্মা বলিয়া একটি জিনিষ। এখন কথা হইতেছে মানুষের এই যে চিন্ময় সত্তা, আত্মা, এখানে দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ বস্তুটি নাও থাকিতে পারে। সংঘর্ষ হইতেছে প্রকৃতির কথা, পুরুষে পুরুষে সংঘর্ষ নাই। মানুষে মানুষে সংঘর্ষ হয় তখন যখন মানুষ প্রকৃতির দাস, পুরুষ যখন নামিয়া আসিয়া প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া যায় অর্থাৎ যখন ফুটিয়া উঠে অহঙ্কারের খেলা। কিন্তু মানুষ যদি স্বপ্রতিষ্ঠ হয়, জীব যদি আপন পুরুষ-সত্তা প্রকৃতির উর্দ্ধে স্থাপন করে তবে মানুষ কাজ করে অহঙ্কার-বিবর্জ্জিত হইয়া, পরস্পরের প্রকৃতির মধ্যেও ফুটিয়া উঠে একটা সামঞ্জস্য ও সম্মিলন। যেমন বহুল বিভিন্ন ধ্বনি মিলিয়া সৃষ্টি করে ঐক্যতানের মূর্চ্ছনা, সেই রকম বহুল বা বিভিন্ন ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়াও মানুষ গঠন করিতে পারে একটা সমন্বয়ের সমাজ।

সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতা লইয়া যে সমাজ সে সমাজ সকলের জন্য নহে, সে সমাজে বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া উন্নতি করিয়া থাকিতে পারে এক বিশেষ প্রকৃতির মানুষ। কি প্রকৃতির মানুষ, তাহা বুঝিতে পারি সমাজ এই 'উন্নতি করা' কথাটা কি অর্থে ব্যবহার করে সেই দিকে একটু নজর দিলে অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে প্রাণময় স্তরের

গুণাবলীই প্রধান, অন্য কথায় যাহাদের আছে ছল বল কৌশল। এইরূপ সমাজে কার্য্যকরী গুণ ছাড়া আর কোন গুণ ফলপ্রসূ হইতে পারে না; কাজ ছাড়া, বাহিরের সফলতা ছাড়া ব্যক্তির স্বাধীন সত্য—মূল সত্তার উদ্বোধন এখানে হয় না। এমনও যদি স্বীকার করি এ সমাজে বাস্তবিকই হয় যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন, তবে বলিব যোগ্যতমের মধ্যেও এখানে বাছাই হয়, স্থান মান সফলতা সার্থকতা পায় যোগ্যতমের মধ্যে আবার যাহারা যোগ্যতম, যাহাদের আছে প্রতিভা; যাহারা সকল বাধা বিপত্তি সকল নিম্নাভিমুখী টান কাটিয়া ছাঁটিয়া জোর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, দেখাইয়াছে প্রাণময় অন্নময়—বড় জোর মনোময় সত্তার মহিমা, সেই দুই চারিজন লোকেরই জীবন এই সমাজে সার্থক। এ রকম ব্যবস্থায় ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সকলে সমান সুবিধা সুযোগ বা অধিকার পায় না; প্রত্যেক মানুষেরই আছে যে একটা প্রতিভা, ব্যক্তিমাত্রেরই আছে যে একটা নিজস্ব মর্য্যাদা (Greenএর Worth of Persons) সে সত্যটি মানিয়া ত লওয়াই হয় না, সেটা সত্য কি মিথ্যা তাহা যাচাই করিয়া দেখিবারও কোন সুযোগই দেওয়া হয় না।

ভাবী-সমাজ

বর্ত্তমান ব্যবস্থার একটা প্রয়োজন ও সার্থকতা থাকিতে পারে, কিন্তু সেটাকে চিরকালের ব্যবস্থা করিয়া গ্রহণ করিলেই ভুল হইবে ; সে ব্যবস্থা বিবর্ত্তনের একটা বিশেষ স্তরের কথা, বিবর্ত্তনের সব কথা বা মূল ধারা তাহাতে ধরা দেয় নাই। ব্যক্তির পক্ষে উচ্চতর সাধনা ও সিদ্ধিকে ধারণ করিবার জন্য প্রথমে স্থূল আধারকে থানিকটা উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হয়, অন্ততঃ স্থূল আধারের কিছু ধারণ-সামর্থ্য না থাকিলে উচ্চতর সাধনা ও সিদ্ধি ফুটিয়া উঠিতে পারে না—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং ; সেই রকম সমাজের মধ্যেও একটা উচ্চতর জীবনস্রোত বহাইয়া দিতে হইলে সমাজের নিম্নতর স্তরকে একটু দৃঢ় করিয়া লইতে হয় নতুবা সে স্রোত আসে না, অথবা অসময়ে আসিলে সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লইয়া যায়। মানুষ ও মানুষের সমাজ এখন প্রাণময় স্তরে দাঁড়াইয়া মনোময় স্তরের পরিচয় লইতেছে। বিবর্ত্তনের পরবর্ত্তী সোপানে মানুষকে মানুষের সমাজকে মনোময় স্তরের উপর দাঁড়াইয়া অধ্যাত্ম স্তরের পরিচয় লইতে হইবে। কিন্তু এই অধ্যাত্ম স্তরের পরিচয় সম্ভব হইবে না, হইলেও খাঁটি হইবে না, যদি নীচের মনোময় ও প্রাণময় স্তরে একটা সামর্থ্য পূর্ব্ব হইতেই

আহরিত না হইয়া থাকে। আমরা বলিতে চাই সমাজের বর্ত্তমান সংঘর্ষের ব্যবস্থা সমাজে দিয়াছে এই মনোময় ও প্রাণময় স্তরের সামর্থ্য। কিন্তু আবার ব্যক্তির পক্ষে যেমন আসন প্রাণায়ামই যদি মুখ্য হইয়া উঠে, তবে তাহার সাধনা হয় ব্যর্থ, সে হইয়া পড়ে আধ্যাত্মিক কুস্তিগীর অথবা ভেল্কিবাজ—সেই রকম সমাজে দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের জের যদি অতিমাত্র টানা যায় তবে সে সমাজ আর সমাজ নামের উপযুক্ত থাকে না, তাহা হইয়া পড়ে সমরাঙ্গন—তাহার ধ্বংসও বোধ হয় বেশী দূরে নাই।

সমাজকে যদি আরও টিকিয়া থাকিতে হয়, সমাজের মধ্যে মানুষ যদি চায় মহত্তর সার্থকতা তবে তাহার রূপকে বদলাইয়া ফেলিতেই হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির আছে একটা মর্য্যাদা, একটা বিশেষত্ব, প্রতিভা—সেইটুকু ফুটাইয়া ফলাইয়া বুঝিবার সুযোগ স্বাধীনতা পূর্ণ অবকাশ দিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি কি দিতে পারে, তাহার উপর সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে; সমাজ ব্যক্তির নিকট হইতে কি আদায় করিতে পারে অথবা বাধ্য হইয়া ব্যক্তি কি দেয়, তাহার উপর নহে। এইটুকু বুঝিতে হইবে, প্রত্যেকেরই আছে

সম্পদ্, থাকিবার সুতরাং সৃষ্টি করিবার আনন্দ; সেই জিনিষটাকে বাহির করিতে হইলে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের প্রয়োজন নাই, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ তাহাকে চাপিয়া আটকাইয়া রাখে, তাহার জন্য চাই হাঁপ ফেলিয়া চলিবার অনেকখানি ফাঁকা যায়গা। এই রকম ফাঁক পাইলে দুই এক জনের নয় অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় নিজের অন্তরাত্মার দিকে দৃষ্টি দিতে, নিজের আনন্দ যাহাতে সেই ধর্ম্ম সেই কর্ম্ম অনুসরণ করিতে। এই ব্যবস্থায় সমাজে প্রথম প্রথম কিছু শিথিল নিস্তেজভাব আসিলেও আসিতে পারে, এত দিনের সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া গেলে মানুষ কিছুকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু সে ভাবটা কাটিয়া গেলে আসিবে একটা পূর্ণতর ঋদ্ধতর জীবনের স্রোত। রজোভাবের খেলার পর আসে তমোভাব, কিন্তু সে তমোভাব ঠিকমত চালাইতে জানিলে উঠাইয়া ধরে সত্ত্বের মধ্যে। An idle mind is the Devil's workshop কথাটা সব সময় সত্য নয়, idle mindএর মধ্যেই আবার কখন কখন ভাগবত শক্তির বীজ উপযুক্ত ক্ষেত্র পায়। আর এমনও যদি হয়, বাহিরের তাড়না না পাইয়া কেহ কেহ একেবারে তমোগ্রস্ত হইয়া প্রকৃতিলীন

হইয়া যায়, তাহাতেও সমাজের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। যাহারা যাইবার তাহারা যুদ্ধে অর্থাৎ অপঘাতে না মরিয়া, আস্তে আস্তে প্রাণশক্তির হ্রাসের ফলে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; কিন্তু থাকে যাহারা তাহারা সমাজকে দেয় একটা বিভিন্ন গতি ও প্রকৃতি, একটা উচ্চতর প্রতিষ্ঠান।
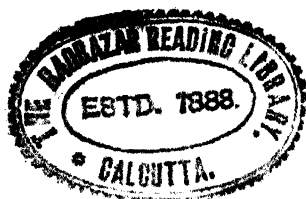
ভাবী-সমাজ

৫

আজকালকার দিনে জীবন-সমস্যা এত কঠিন হইয়াছে কেন? কারণ, জীবিকা লইয়া সংগ্রাম মানুষের মধ্যে ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে। এই সংগ্রামই বা এমন ঘোরতর হইয়া উঠিল কোন্ কারণে? কারণ এই যে প্রত্যেক মানুষকে আলাদা আলাদা ভাবে নিজের জীবনোপায়ের চেষ্টা করিতে হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি চলিতে চাহিতেছে পৃথক পৃথক একা একা, তাই দেখা দিয়াছে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের রেষারেষি ও অনিবার্য্য সংঘর্ষ। আমি আমার জন্য যে স্থান করিয়া লইতে পারি তাহা আর কেহ দখল করিয়া লইতে পারে,

এই আশঙ্কা আমার সকল প্রচেষ্টার মূলে—তাই আমি অপর প্রত্যেককে দেখি প্রতিদ্বন্দ্বীর চক্ষে, আমার কর্ম্মের উপায় তাই হয় বল, ছল, কৌশল। আমি দাঁড়াইতেছি সমস্তের বিরুদ্ধে একা, তাই আমার পক্ষে সংঘর্ষের মাত্রা যে শুধু বাড়িয়া যাইতেছে তাহা নয়, সেই সাথে আমার পরাজয়ের সম্ভাবনাও বাড়িয়া যাইতেছে। তাই আসিয়াছে আশু লাভের উপর লোভ, যে যতটুকু পারে হস্তগত করিয়া লইবার ত্রস্ততা, অল্পে তুষ্টি, কিন্তু বহুৎ বুভুক্ষা। মানুষ হইয়া পড়িতেছে সব খণ্ড খণ্ড ছোট ছোট জীব —অন্য অর্থে একেবারে হুবহু "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ"।

এই রকম অবস্থার গোড়ার হেতু যদি খুঁজিতে যাই তবে দেখি তাহা একটা খুব ন্যায্য ও বড় আদর্শ—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ স্বাধীন হইবে, আপন অন্তরাত্মার প্রেরণায়, মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে—অপরের নিকট আত্মবলি দিয়া দাসখত লিখিয়া দিয়া আপন ব্রহ্মত্বকে ক্ষুণ্ণ করিবে না—এই যে ইদানীন্তন কালের ভাব, ইহাই রহিয়াছে বর্ত্তমান ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের, কামড়াকামড়ির পিছনে। কিন্তু এমন একটা আদর্শের বাস্তবে এমন বিকৃতি হইল কি করিয়া? বিকৃতি হইল এই জন্য যে মানুষ একটা আদর্শের অনুকরণ করিতে

গিয়া আর একটি আদর্শকে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। একটি আদর্শের বিকৃতির প্রতিষেধ করিতে গিয়া, প্রতিক্রিয়ার ফলে আর একটি আদর্শের বিকৃতির মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে।

আগে মানুষকে দেখা হইত একটা বিশেষ গোষ্ঠীর অঙ্গরূপে—সেই গোষ্ঠীর সমবেত জীবন ছাড়া ব্যক্তির নিজস্ব জীবনের মূল্য যে খুব বেশী তাহা বিবেচিত হইত না। প্রাচীন গ্রীসে, রোমে, ইউরোপের দেশ বা নেশনবাদে, আমাদের সামাজিক তন্ত্রে মানুষ যে "পলিটিক্যাল্ প্রাণী" অথবা সামাজিক জীব, এই কথাটিরই উপর জোর দেওয়া হইত। মানুষকে ধরিয়া লওয়া হইত একটা যন্ত্রের অঙ্গরূপে—সমষ্টির সার্থকতায় তাহার সার্থকতা, তাহার কাজ সমষ্টির জন্যে আত্মবলি দেওয়া, নিজের তাহার কোন পৃথক সার্থকতা নাই। এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে আসিয়া পড়ে ব্যক্তিত্বের উৎপীড়ন নিষ্পেষণ। এবং ইহার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠে তাহাই হইতেছে আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ।

কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ চলিয়াছে আর এক অতিমাত্রার দিকে। সমষ্টির চাপে যে ব্যক্তির আত্মা নিষ্পিষ্ট হইয়া চলিয়াছিল আজ তাহা বিদ্রোহী হইয়া

উঠিয়া বলিতেছে ব্যক্তির পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বই সব। আগে চাই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ জাগরণ, উদ্বোধন—যেখানে যে ব্যবস্থায় এই আদর্শ সম্ভব সেইখানেই আদর্শ সমাজ। এমন কি ইহাতে যদি সমাজ-প্রতিষ্ঠান ধ্বংসও পায় তাহাতেও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। মানুষ সমাজের জন্য নয়, সমাজই মানুষের জন্য। এই হইতেছে নৈরাজ্য বা এনার্কিজমের (Anarchism) ধূয়া।

যাঁহারা সমাজকে ধ্বংস করিতে চাহেন, রাখিতে চাহেন কেবল আপন আপন পথের পথিক কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই না। আমাদের কথা হইতেছে দশ জন লইয়া, যাহারা থাকিতে চায়, যাহাদের উদ্দেশ্য, সমাজের বা গোষ্ঠীর মধ্যে রহিয়া সার্থকতা লাভ করা। অবশ্য অনেকে মনে করিতে পারেন, এবং আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিতরকার প্রচ্ছন্ন ভাবটাও হইতেছে এই যে, সমাজ থাকিবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহা হইবে স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিবর্গের সঙ্ঘ। সমাজ হইতেছে সাধারণ মানব-জাতি, আর প্রত্যেক ব্যক্তি এই সমষ্টির সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট থাকিবে—কোন রকম মধ্যস্থ বা দালালের সহায়ে নয়। নেশন বল, বিশেষ সমাজ বল, এমন কি

একটা পরিবারও যদি ধর, সে সবই হইতেছে ঐ মধ্যস্থ বা দালাল। সমষ্টিগত জীবন যে ব্যক্তিগত জীবনের উপর অত্যাচার করিয়াছে তাহার কারণ ঐ সব মধ্যস্থ বা দালালের অস্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের অধিকারকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে যাইয়া তাই অনেকে আজ সার্ব্বভৌমিক হইয়া পড়িতেছেন—নেশন ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন, দেশগত সমাজ ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন, পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া চলিয়াছেন। অর্থাৎ সকল রকম গোষ্ঠীগত কেন্দ্র ভাঙ্গিয়া ব্যক্তিকেই মানব-জাতির একমাত্র কেন্দ্র করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন।

কিন্তু ফলে আমরা দেখিতেছি কি হইতেছে? ব্যক্তির উপরে অত্যাচারের মাত্রা কি বাড়িয়াই যাইতেছে না? অন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র (International socialism), বোলশেভিজ্‌ম প্রভৃতি নবীন ব্যবস্থায় দেখি না কি ব্যক্তিকে একটা বৃহত্তর যন্ত্রের কবলিত হইয়া যাইতে হইতেছে? স্বাধীন স্বতন্ত্র হওয়া দূরের কথা, আগের অপেক্ষা ব্যক্তির জীবন আরও দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিতেছে। আপনাকে একক একলা মুক্ত দেখিবার লোভে পড়িয়া মানুষ যেন একটা অনন্ত মরু-ভূমির শূন্যতার চাপে হাঁপাইয়া উঠিতেছে।

ভাবী-সমাজ

সমষ্টির সহিত সম্বন্ধ মানুষ সাক্ষাৎভাবে স্থাপন করিতে পারে না—অর্থাৎ জীবনের মধ্যে থাকিয়া, জীবনের অতীত হইলে তাহা পারা যায় বোধ হয় ত। কিন্তু জীবন-প্রতিষ্ঠানে থাকিয়া সমষ্টির সহিত সংযুক্ত হইতে হইলে মানুষের পক্ষে চাই একটা মধ্যস্থ অর্থাৎ একটা বিশেষ গোষ্ঠী, একটা সঙ্ঘ বা সংহতি। এই রকম বিশেষ গোষ্ঠী ছাড়া মানুষ কোন দিনই চলে নাই—গোষ্ঠীর অত্যাচার থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া জিনিষটা আসলে অসত্য হইতে পারে না। মানুষের সমস্ত ইতিহাস এই কথারই প্রমাণ করিতেছে।

এখন সমস্যা—কি রকম গোষ্ঠী মানুষের পক্ষে সত্য ও কল্যাণময়? যে গোষ্ঠীকে মানুষ যত আপনার করিয়া ধরিতে পারে, সে গোষ্ঠী যন্ত্র না হইয়া ততই তাহার পক্ষে জীবন্ত, রসাত্মক, আনন্দদায়ক হইয়া উঠে। অর্থাৎ সেখানে একটা সমবেত জীবনধারার মধ্যে তাহার ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনাও অব্যাহত থাকে। নেশন বা সমাজ এ রকম গোষ্ঠী নয়, ও-গুলি হইতেছে আরও দূরের, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্য্যায়ের গোষ্ঠী। মানুষের সব চেয়ে নিকটের গোষ্ঠী হইতেছে নিজের পরিবার অর্থাৎ নিজে, স্ত্রী ও সন্তানগণ। এই তিনটি জিনিষ লইয়া হইতেছে সমাজ-

দেহের মূলকোষ। কিন্তু সমবেত জীবনের দিক দিয়া এ রকম পরিবারকেও ঠিক গোষ্ঠী বলা যায় না। এ পরিবারও হইতেছে ব্যক্তিরই রকমফের, একটি ব্যক্তিরই প্রসার বা পরিধি মাত্র। জীবনযুদ্ধে এখানে একটি ব্যক্তিকেই একক হইয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে—পরিবারের আর কয়েকজন হইতেছে তাহারই আশ্রিত। পরিবারের যিনি কর্তা তিনিই একক আর সকলের ভার বহন করিতেছেন। শুধু পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া যদি ব্যক্তি চলে, প্রত্যেক পরিবার যদি আলাদা আলাদা ভাবে আপন আপন পথ দেখে, তবে সে রকম সমাজেও যথার্থ সামাজিক বা সমবেত জীবন ফুটিয়া উঠে না এবং ব্যক্তি জীবনযুদ্ধে আপন সামর্থ্য ছাড়া অন্য দ্বিতীয় শক্তির সাহায্য কিছু পায় না। আজকালকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে —নিছক একলা চলা বাস্তবে অসম্ভব বলিয়া—শুধু আপনার পরিবার অর্থাৎ আপন স্ত্রী ও সন্তানবর্গকে লইয়া যে আমরা চলিতে চাহিতেছি, সেখানেও পৃথক্ পৃথক্ ছুটা ছুটা ব্যক্তিত্ব লইয়া চলার যে দোষ তাহাই রহিয়াছে। অর্থাৎ একটি ব্যক্তিকে ধরিয়া যে পরিবার তাহাকে আমরা বলিতে পারি সমাজের পরমাণু (atom)—কিন্তু পরমাণু নয়, অণুই (molecule) হইতেছে বস্তু-সত্তার লীলা-কেন্দ্র।

ভাবী-সমাজ

আমাদের দেশে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের, সমবেত জীবনের কেন্দ্র ছিল আগে ব্যক্তি নয়, ক্ষুদ্র পরিবারও নয়, কিন্তু বৃহৎ পরিবার অর্থাৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার। এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্য দিয়া সমাজের বহুল সম্বন্ধ প্রতিফলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে যেমন, তেমনি ইহাতে মস্ত সুবিধা ছিল এই যে ব্যক্তিকে এখানে একেবারে আলাদাভাবে একলাটি জীবন যাপনের জন্য দাঁড়াইতে হইত না, অনেকে এক সঙ্গে সংহত হইয়া থাকিত বলিয়া প্রত্যেকেরই সামর্থ্য বাড়িয়া যাইত—যে যাহা পারিত উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া সাধারণ ভাণ্ডারে দিত, ব্যক্তিগত হিসাবে হয়ত যাহাতে অকুলান হইত, মিলিত হইয়া তাহাই সকলের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট হইত। আর যে কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারিত না, তাহাকেও একেবারে পথে বসিতে হইত না, সকলের মধ্যে থাকিয়া তাহারও দিন চলিয়া যাইত। ব্যক্তির দিক্ দিয়া আরও একটি সুবিধা ছিল এই যে, প্রত্যেকের পরিশ্রমের মাত্রাও কম দরকার হইত—আজকাল যেমন তাহাকে অষ্টপ্রহর হা অর্থ, হা অর্থ করিয়া ছুটাছুটি করিতে হয়, তাহার সমস্ত মন প্রাণ দেহ ঐ এক লক্ষ্যে, এক ধ্যানে, এক জ্ঞানে নিয়োগ করিতে হয়—সেই রকম বৃহৎ

পরিবারের অঙ্গীভূত হইয়া থাকাতে তাহাকে নিত্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নিত্য শ্রান্ত হইতে হইত না, তাহার অবসর মিলিত যথেষ্ট, অর্থ ছাড়া অন্য কিছু বৃহত্তর মহত্তর লক্ষ্যের দিকে নজর দিবার সুযোগ সে পাইত।

তাই বলিয়া একান্নবর্ত্তী পরিবারই যে আদর্শ গোষ্ঠী তাহা আমরা বলিতেছি না। গোড়ায় এ ব্যবস্থা যতই সুন্দর সুস্থ থাকুক না, পরে যে ইহাতে পচ ধরিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সময়ে সব প্রতিষ্ঠানেরই হয় ত ঐ একই পরিণাম। কিন্তু তবুও সংহত জীবনের এ ছিল একটা আদর্শ। এই ব্যবস্থাটা গড়া হইয়াছিল রক্তের টানের উপর। রক্তের টানের জোর কত, ও তাহা সহজ ও স্বাভাবিক কত, তাহা আমরা জানি—ইহার সহায়ে ব্যক্তিত্বের ও সামাজিকত্বের সামঞ্জস্যও কত সহজ, স্বাভাবিক ও সুদৃঢ়, তাহাও বিনা আয়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

তবে সময়ের স্রোতে এই একান্নবর্ত্তী পরিবার ব্যক্তিত্বের উপর বেশী অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল, দুই এক জনের পরিশ্রম বহুর আলস্যকে প্রশ্রয় দিতে লাগিল, তাহা হইয়া উঠিল কলহের, দ্বন্দ্বের, রেষারেষির ক্ষেত্র। ইহার প্রাণ চলিয়া গিয়া যখন কেবল দেহটী পড়িয়া রহিল

তখন হইতেই ইহার ভাঙ্গন স্বরু হইয়াছে। এই পুরাতন ব্যবস্থাকে আর ফিরাইয়া আনা সম্ভব নয়। চাই একটা নূতন প্রাণ ও নূতন দেহ। একটা নূতন তত্ত্ব ও নূতন রূপ দিয়া নূতন গোষ্ঠী-জীবন গড়িতে হইবে।

আগে চাই নূতন একটা তত্ত্ব। আধুনিক সমবায়-তন্ত্র (Co-operative System,—syndicates, guilds, unions, associations) গোষ্ঠী-বাঁধনের একটা নূতন তত্ত্ব দিবার চেষ্টা করিতেছে। রক্তের বাঁধনের পরিবর্ত্তে ইহা দিতেছে স্বার্থের বা জীবন-প্রয়োজনের বাঁধন। একই শ্রেণীর বা একই উপজীবিকার লোক জোট বাঁধিয়া, প্রত্যেকের পরিশ্রমের ফল সম্মিলিত করিয়া এক একটা গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ বা সংহতি গড়িয়া তুলিতেছে। ইহার সুফল এত আশু যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশেই ইহার প্রসার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠানের অভাব হইতেছে তিনটি। প্রথমতঃ ইহা আবদ্ধ সমাজের অধস্তন শ্রেণীর অর্থাৎ কেবল মজুর বা শ্রমিকদের মধ্যে। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের উদ্দেশ্য বেশীর ভাগই হইতেছে আত্মরক্ষা, বিরোধী পক্ষের, ধনিকের সহিত যুদ্ধ করা—অর্থাৎ উদ্দেশ্য যতখানি অভাবাত্মক ততখানি ভাবাত্মক নয়। আর তৃতীয়তঃ ইহারা সমস্ত

জীবনটি, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আলিঙ্গন করিয়া ধরে নাই—সমস্ত জীবন নয়, ইহারা ধরিয়াছে কেবল জীবিকা। সুতরাং এই সকল প্রতিষ্ঠানকে যদি জীবন্ত গোষ্ঠী করিয়া তুলিতে হয় তবে দেখিতে হইবে কি রকমে ইহাদিগকে সমস্ত জীবন-প্রয়াসের কেন্দ্র করিয়া তোলা যায়, কি রকমে ইহাদিগকে সৃষ্টির ক্ষেত্র করিয়া তোলা যায়, কি রকমে ইহাদিগকে সমাজের সকল স্তরে সকল দিকে গড়িয়া তোলা যায়। এই সকল গোষ্ঠী কেবলই উপজীবিকার সহায় হইবে না, কিন্তু হইবে শিক্ষাদীক্ষার এবং সমস্ত সামাজিক জীবনের কেন্দ্র। এই রকমের একটি প্রয়াস আয়র্লণ্ডে চলিতেছে। আয়র্লণ্ডের কবি জর্জ্জ রাসেল (George Russel) চেষ্টা করিতেছেন গ্রাম্য-সমিতি, শ্রমিকসজ্ঘ সমূহকে কি উপায়ে সমস্ত জীবন-সাধনার কেন্দ্র করিয়া তোলা যাইতে পারে—ব্যক্তিগত জীবন আর সমষ্টিগত জীবনের মধ্যকার সেই জাগ্রত গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান-রূপে গড়িয়া তোলা যায়।

তা ছাড়া, গোষ্ঠীবন্ধনের আরও উচ্চতর তত্ত্ব পাওয়া যায় কি না তাহাও দেখিতে হইবে। শুধু দেহের টান নয়, কিম্বা কেবলই স্বার্থের সহযোগ নয়; কিন্তু অন্তরাত্মার মিলনের উপর কোন গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায়

কি না। ধর্ম্মসজ্ঘ সমূহ যে রকমে সৃষ্টি হয় ও হইতেছে, সেই রকম একটা অন্তরাত্মার (আধ্যাত্মিক বলিলেও বলিতে পারি) তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া সমাজের মধ্যেই জীবনের সঙ্ঘ সৃষ্টি করা একেবারে অসম্ভব না'ও হইতে পারে।

সে যাহা হউক, আসল কথা হইতেছে এই মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে আর একলার পথে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না—একলার পথ হইতেছে সন্ন্যাসীর আর না হয় ভবঘুরের। ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এক একটা গোষ্ঠীর মধ্যে। চক্র বাঁধিয়া মানুষকে সমাজের মধ্যে চলিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষকে এই রকম আপনার চক্র খুঁজিয়া পাইতে হইবে, গড়িয়া লইতে হইবে। চক্রের সহিত জীবনে এক দিকে যেমন তাহার জীবন-যুদ্ধের তাড়না, কঠোরতা কমিয়া যাইবে, তেমনি সেখানে একটা সমবেত সার্থকতার মধ্যে তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও পাইবে সত্য সার্থকতা।

ভাবী-সমাজ

৬

চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের একটা গভীর সত্য ; এই চাতুর্ব্বর্ণ্য যদি ঠিক ঠিক ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে তবেই সমাজ সজীব সুস্থ সবল অবস্থা পায়। আজকাল জগতের সকল সমাজে যে ভীষণ বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে, মানুষের জীবন যে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ কিছুই নয়, বর্ণধর্ম্মের অভাব—কোথাও বর্ণে বর্ণে মিশিয়া অর্থাৎ ঠিক ঠিক না মিশিয়া খিচুড়ী পাকাইয়াছে, কোথাও এক বর্ণ অতিকায় হইয়া উঠিয়া আর সকলের উপর আধিপত্য অত্যাচার করিতেছে। আধুনিক সমাজের এই বর্ণ-সঙ্করের কথা আমরা পরে কিছু বলিতেছি ; কিন্তু

চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রকৃত অর্থটা কি, এই সত্যকার বর্ণতন্ত্রের উপর সমাজ দাঁড়াইলে তাহার কি রূপ হয়, সেইটাই আগে ভাল করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব ; অর্থাৎ প্রথমে বলিব আদর্শের কথা, পরে এই আদর্শের সাথে তুলনা করিয়া বর্ত্তমানের বাস্তব অবস্থা কিছু উল্লেখ করিব।

সমাজের আছে চারিটি অঙ্গ, এক এক শ্রেণীর লোক এক এক অঙ্গ, সকলে মিলিয়া সমাজকে বাঁচাইয়া বাড়াইয়া চলিয়াছে, আপনা-আপনাকেও সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের প্রতিষ্ঠা কোথায়, কিসের উপর সে দাঁড়াইয়া আছে, জীবনের মূল কোথায় ? মাটি, জমি। মানুষের বাঁচিতে হইলে চাই অন্ন, এই অন্ন জোগাইতেছে মাটি। শুধু অন্ন নয়, সভ্যতার একটা প্রয়োজন যে বস্ত্র তাহাও সাক্ষাৎভাবে না হউক, পরোক্ষ-ভাবে জুটাইতেছে ঐ মাটি—আবার অন্নবস্ত্র নয়, প্রয়োজনের বাড়া ঐশ্বর্য্যও আসিতেছে ঐ একই মাটি হইতে। ফলতঃ টাকা কড়ি ধন নয়, ধনের চিহ্ন বা মাপ ; আসল ধন হইতেছে মাটি। এই মাটি আবাদ করিয়া সত্য সত্যই লোকে সোনা ফলাইয়া থাকে। এখন, সমাজের যে সব লোক সাক্ষাৎভাবে মাটির সহিত সংশ্লিষ্ট, যাহারা নিজের হাতে মাটিতে আঁচড় দেয়—অর্থাৎ চাষী, চাষ করে যে,

সেই হইতেছে শূদ্র*। জমি যদি কাহারও হয়, তবে শূদ্রই প্রকৃতপক্ষে জমিদার। তারপর এক শ্রেণী আছে যাহারা শূদ্রের মত অত ঘনিষ্ঠভাবে মাটি ধরিয়া নাই, মাটি হইতে তাহারা একটু তফাতে; শূদ্র যে কাঁচামাল ফলায়, ইহারা সেই সব জিনিষ এখানে ওখানে আনা-নেওয়ার বিলি-বন্দোবস্ত করে, সেই সব জিনিষ লইয়া কৌশলে আরও সহস্র রকম জিনিষ তৈয়ার করে, দেশের লোকের বা সময়ের প্রয়োজন মত গড়া ও সরবরাহ করাই ইহাদের কার্য্য। ইহারা হইল বৈশ্য। তারপর ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের কাজ রক্ষণাবেক্ষণ, দণ্ডধারণ, শাসন; ক্ষত্রিয়ই হইতেছে গবর্ণমেণ্ট বা রাষ্ট্র (state). ক্ষত্রিয়ের পর ব্রাহ্মণ। শূদ্র মিটাইতেছে প্রয়োজন, বৈশ্য দিতেছে স্বচ্ছলতা, ক্ষত্রিয় দিতেছে শান্তি—কিন্তু সমাজের মানুষের প্রয়োজন আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা এখানেই শেষ নয়। এ সকলই শুধু এ জগতের ঐহিকের ন্যূনাধিক বাহিরের কথা; তাই ব্রাহ্মণের উদ্ভব, যে দিতেছে সব জিনিষের ভিতরের সমুচ্চের বস্তু—তত্ত্বজ্ঞান আত্মোপলব্ধি। শিক্ষা সাধনা হইতেছে ব্রাহ্মণের কাজ।

আমরা শূদ্রকেই মাটির ন্যায্য ও একমাত্র অধিকারী

* শূদ্র কথাটা আমি একটু নূতন অর্থে ব্যবহার করিতেছি।

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু দাঁড়াইবার বাঁচিবার ঠাঁই শূদ্রের থাকিলেও ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যেরও সে ঠাঁই দরকার। কিন্তু এই তিনবর্ণ দ্বিজাতি—অর্থাৎ শূদ্রের মত তাঁহারা একবার মাটিতে মাত্র জন্মেন নাই, মাটিতে জন্মিয়া আবার মাটি হইতে সরিয়া একটু দূরে আর একবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মাটির উপর সাক্ষাৎ দাবী ইঁহাদের নাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয় হউন, আর বৈশ্য হউন নিজ হাতে ইঁহারা লাঙ্গল ধরিতে পারেন নাই, তাই জমি ইঁহাদের নাই, কিন্তু জমি না থাকিলেও জমির উৎপন্নে ইঁহাদের এক একটা অংশের দাবী আছে—শূদ্রকে এ দাবী স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সমস্ত সমাজের স্থিতি ও ঋদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিজের স্বার্থ হিসাবেই শূদ্রের প্রয়োজন আছে আর আর বর্ণের সাহায্য সহযোগিতা। নিজের অশনের ব্যবস্থা শূদ্রের নিজের হাতে থাকিলেও ভূষণের জন্য তাহাকে যাইতে হইবে বৈশ্যের কাছে, এমন কি, সকল প্রয়োজনীয় আহার্য্য বস্তু সে নিজের জমিতে নিজের চেষ্টায় ফলাইতে পারে না, এজন্য নিজের বর্ণেরই অন্যান্যের সাথে যে লেনা-দেনা করিতে হয় তাহাও বৈশ্যের রাজ্য। তারপর শূদ্রের দরকার অভয় শান্তি; সকল বিপদ সকল আপদ হইতে

রক্ষার জন্য সব সময়ে যদি নিজেকেই তাহার দণ্ডধারণ করিতে হয় তবে হল-ধারণের অবকাশ হয়ত তাহার থাকিবেই না, তাই সে জন্য তাহাকে ক্ষত্রিয়ের সাহায্য চাহিতে হইবে। আর শূদ্রের চাই জ্ঞান দীক্ষা সাধনা— সে জন্য তাহাকে ব্রাহ্মণের দ্বারস্থ হইতে হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নিজ হাতে হাল চাষ করিতেছেন না বলিয়া জমির ফল হইতে ইঁহাদিগকে শূদ্র বঞ্চিত করিতে পারে না, করিলে তাহাকে আত্মঘাতী হইতে হইবে।

অথবা অন্য দিক দিয়া, সমষ্টির দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমরা বলিব, জমি কাহারও নয়, জমি হইতেছে সকলের—ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের ও শূদ্রের ; কারণ সকলেই সমাজের এক একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ, প্রত্যেকেই অপর সকলকে আপন সামর্থ্যানুযায়ী যাহা দিবার দিতেছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে ঋণী। সকলেই হয়ত খাইবার পরিবার জিনিষ যোগাইতেছে না বা দিতেছে না, কিন্তু সকলেই দিতেছে যোগাইতেছে এমন জিনিষ যাহার বিনিময়ে তাহার প্রাপ্য খাইবার পরিবার জিনিষ। তবে এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে, জমি সকলের হইলেও ইহা গচ্ছিত আছে শূদ্রের হাতে ; শূদ্রের কাজ (বৈশ্যের সহায়ে) এই গচ্ছিত ধনকে ফলাইয়া বাড়াইয়া তোলা।

কিন্তু মোট আদায় বা লাভ যাহা হইবে তাহা ব্রাহ্মণ হউক, ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্য হউক আর শূদ্রই হউক, সকল বর্ণের মধ্যে একটা ন্যায্য পরিমাণে ভাগবাটরা করিয়া দিতে হইবে। এখন দুটি প্রশ্ন এখানে উঠিবে। ভাগবাটরার ন্যায্য পরিমাণটা কি, তার মানদণ্ডটি কোথায়? আর কে এই ভাগবাটরা করিবে।

ভাগবাটরার পরিমাণ নির্ভর করিবে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রয়োজনের উপর অর্থাৎ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানটি বজায় রাখিতে ও আপন আপন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যাহা দরকার তাহার উপর। পরিমাণের একটা স্থির নির্দ্দিষ্ট অনুপাত (fixed scale) থাকিতে পারে, যেমন আমাদের দেশে প্রাচীন ব্যবস্থায় রাজা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পাইতেন ষষ্ঠ ভাগ অথবা সে অনুপাতকে অবস্থা অনুসারে বাড়ান কমান যাইতে পারে (sliding scale) যেমন কতকটা বর্ত্তমান সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবাটরার পরিমাণ অনুপাত ঠিক করিতে হইবে সকলে মিলিয়া, চারিবর্ণের প্রতিনিধি লইয়া,—তবে এ কাজ বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মকর্ম্মেরই (function) ইহা অন্তর্ভুক্ত। বৈশ্য ও শূদ্র প্রয়োজনীয় তথ্য সব যোগাইবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহার উদার জ্ঞানে

সত্য মীমাংসা ও ব্যবস্থা দিবেন আর ক্ষত্রিয় তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন; এই হিসাবে আমরা বলিতে পারি, ব্রাহ্মণ হইতেছেন সমাজের legislative power আর ক্ষত্রিয় হইতেছেন তার executive power. সকলে মিলিয়া অর্থাৎ এই ডেমক্রাটিক উপায় ছাড়া, সমস্ত কার্য্যটির ভার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মকর্ম্মের অনুযায়ী বলিয়া—শুধু ক্ষত্রিয়ের উপরেই ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কি না, তাহাও বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রয়োজনের কথা আমরা বলিয়াছি; ইহা লইয়া অবশ্য মতভেদ, ঝগড়াঝাঁটি, এমন কি লাঠালাঠি পর্য্যন্ত হইতে পারে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রয়োজনটি বড় করিয়া দেখিবেন, ঝোলের মাছ কোলের দিকে টানিয়া লইবেন, ইহাও স্বাভাবিক স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের দেশে communal representation লইয়া যে মারামারি চলিতেছে, তাহা দেখিয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে পারি। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন তাঁহারা সংখ্যায় কম, সুতরাং তাঁহাদের প্রয়োজন বেশী, অতএব তাঁহাদের দাবীও বেশী; ব্রাহ্মণেতর জাতি সংখ্যাধিক্যের দোহাই দিয়া সেই একই সুতরাং ও অতএব প্রমাণ করিতেছেন। জমিদার শ্রেণী, বণিক শ্রেণী, সকলেই একটা না একটা

প্রয়োজনের হিসাব দেখাইয়া সিংহের ভাগ দাবী করিতেছেন। সেই রকম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিলেও তাহাদের মধ্যে রেষারেষির অভাব যে হইবে তাহা বলি কিসের জোরে? ক্ষত্রিয়ের উপর ভার দিলে, সে হয় ত জোর জবরদস্তি করিয়া একটা মীমাংসা করিয়া দিতে পারে—আজকাল রাষ্ট্র যাহা করিতেছেন। কিন্তু জোর জবরদস্তির ব্যবস্থা খাঁটি ব্যবস্থা নয়, তাহাতে সংঘর্ষের বীজ থাকিয়াই যায়। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, এ ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের পদ্ধতিই অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মণেই ইহার ব্যবস্থা দিবেন। ব্রাহ্মণ অর্থই হইতেছে যাঁহারা সমাজের শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানে ধর্ম্মে সাধনায় যাঁহারা সমাজের চক্ষুঃস্বরূপ। প্লেতো এই জন্যই চাহিয়াছিলেন Rule of the philosophers, আর খৃষ্টীয়ানেরা চাহিয়াছিলেন Reign of the saints; মানুষ ভয় করে অপরের স্বার্থের আক্রমণকে; কিন্তু যেখানে দেখি নিঃস্বার্থপরতা, সেখানে পরম দুর্বৃত্তও সহজেই মস্তক অবনত করে, অন্ততঃ দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য সেই খানেই মন্দের ভাল বিবেচনা করে। তবুও যদি কোন বিশেষ শ্রেণী এমন গৃধ্নু—এমন শক্তিশালী হইয়া উঠে—ভারতে এককালে ব্রাহ্মণই এই রকম হইয়া

উঠিয়াছিল—যে কোন মীমাংসার সে ধার ধারিতে চায় না, চলিতে চায় নিজের জোরে, প্রতিষ্ঠা করিতে চায় নিজেরই একচ্ছত্র আধিপত্য, তবে সমাজ জীবিত থাকিলে একটা সমবেত প্রতিক্রিয়ার ফলে সে আধিপত্যচেষ্টা বিফল হইবে, নতুবা সমাজ যদি পঙ্গু ও মৃতবৎ হইয়া থাকে ত কোন মীমাংসাই নাই, শক্তিমানের মীমাংসাই একমাত্র মীমাংসা। কিন্তু এটা হইতেছে ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের কথা, আমরা বলিতেছি সুস্থ সমাজের কথা।

শুধু শ্রেণী হিসাবে নয়, ব্যক্তি হিসাবেও সমাজের বিত্তের বা অর্থের ভাগবাটরা থাকা দরকার। সমাজ সাক্ষাৎভাবে যদি ব্যক্তির সহিত লেনা-দেনা না করিতে পারেন, তবে অন্ততঃ গোষ্ঠী-সঙ্ঘ বা পরিবার (group, guild or family) হিসাবে সে ভাগবাটরা করিয়া দিতে পারেন ; গোষ্ঠী না হয় আবার নিজের মধ্যে সুবিধা ও প্রয়োজন মত ব্যক্তিক্রমে বিলি-বন্দোবস্ত করিবেন, সিধা দিবেন। যে ব্যক্তি অথবা যে গোষ্ঠী যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যে বর্ণের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম পালন করিতেছে, সেই শ্রেণীর বা বর্ণের প্রাপ্য অংশ হইতে একটা অংশ পাইবে। ইহাও নির্দ্ধারিত হইবে ব্যক্তির অথবা গোষ্ঠীর প্রয়োজন হিসাবে।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়

বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয় পরস্পর হইতে ছিন্ন একেবারে পৃথক পৃথক স্তর নয়, এই বর্ণ-বিভাগ হইয়াছে মানুষের গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে। ব্রাহ্মণের বংশে বা ব্রাহ্মণের গোষ্ঠীতে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম পায় নাই, ব্রাহ্মণের কাজ করিতে পারে না, করিতে চায় না—সে নিজের রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে যে বর্ণের কাজ করিতে চায় ও পারে সেই কাজ চাহিবার ও করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাহার থাকিবে। ব্রাহ্মণের এক ভাই যদি জ্ঞান বিজ্ঞান লইয়া না থাকে, সে যদি হল চালনা করে তবে তাহাকে শূদ্র বলিয়া গণনা করিতে হইবে, আবার শূদ্রের এক ভাই মাটি ছাড়িয়া যদি কোন মস্তিষ্কের চেষ্টা করিতে চলে, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরিতে হইবে। অবশ্য, এ রকম কর্ম্ম পরিবর্ত্তনে মানুষের যে কিছু উত্থান বা পতন হইল তাহা নয়। ইহার তুলনা প্রাচীন কালের ব্যবস্থা নয়—প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের কাজ লইত তবে সেটি তাহার পক্ষে অধঃপতন বলিয়া বিবেচিত হইত; আর শূদ্রের আদর্শ ছিল শূদ্রত্ব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিবে। ইহার তুলনা বরং আমাদের আধুনিক সমাজ হইতে দিতে পারি—বিভিন্ন বর্ণে—যে পার্থক্য

তাহা হইতেছে বিভিন্ন চাকরী বা পেশায় যে পার্থক্য। শুধু, বিভিন্ন চাকরী বা পেশাতে আয়ের যেমন বেশী কম আছে সেই রকম প্রাপ্য হিসাবে বর্ণে বর্ণে পার্থক্য থাকিলেও থাকিতে পারে।

তার পর আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজ আপন সম্পদ ব্যক্তিকে ব্যষ্টিকে ও গোষ্ঠীকে সমান ভাবে হউক আর একটা বিশেষ অনুপাতে হউক বাঁটিয়া দিবে সত্য, কিন্তু প্রত্যেক ব্যষ্টিকে ও গোষ্ঠীকে দেখিতে হইবে সে যেন এই পাওনার ন্যায্য দাবী করিতে পারে অর্থাৎ তাহার চুপ চাপ বসিয়া থাকিলে চলিবে না, সে যেন আপন ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া সমাজের শ্রী ও শক্তি বৃদ্ধি করে। মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিবার জন্য পুরস্কারের লোভ দেখান বোধ হয় উচিত হইবে না; যে যত কাজ দেখাইতে পারিবে তাহার প্রাপ্যের মাত্রাও বেশী হইবে, এ রকম বন্দোবস্ত হইলে কাজে ভেজাল প্রতারণা আরম্ভ হইতে বিশেষ দেরি হয় না। সমাজ যদি প্রত্যেককে গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্তি দেয়, তাহার স্বভাব ও স্বধর্ম্ম অনুসারে কর্ম্ম করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, তবে মানুষের অন্তর্নিহিত কর্ম্মের প্রেরণা, সাফল্যের আনন্দ, তাহার অন্তরাত্মার

সততার উপরই নির্ভর করিয়া চলে না কি? এই সকল সিদ্ধান্ত, এই স্পৃহণীয় আদর্শের পথে আছে দুইটি বিঘ্ন, এক মানুষের আলস্যপরায়ণতা আর তার ঐশ্বর্য্য-লিপ্সা। প্রথম মানুষ বসিয়া বসিয়া খাইতে চায়, দ্বিতীয়তঃ সে শুধু খাইয়া পরিয়াই সন্তুষ্ট নয়, সে চায় ভাল খাইতে ভাল পরিতে, একটু হাঁকডাক জাঁকজমক। দ্বিতীয় বিঘ্নের কথাটাই আমরা আগে বিচার করিব। মানুষের ঐশ্বর্য্যলিপ্সা কতখানিতে পরিতৃপ্ত হয় আর কতখানিতে হয় না তাহার মাপকাঠি আমাদের নাই; কিন্তু এ কথাটি জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে যে কিছু ভাল খাইতে পরিতে বা খানিকটা হাঁকডাক জাঁকজমক করিতে খুব বেশী অর্থের দরকার হয় না। তারপর আমরা দেখি বাস্তবিক যাঁহারা বড়লোক—লক্ষপতি, কোটিপতি—তাঁহারাও সোনাদানা খান না বা হীরাজহরৎ পরিয়া বসিয়া থাকেন না; বেশী দূর নয়, আমেরিকা বা ইউরোপে যাইবার দরকার নাই, আমাদের কলিকাতায় বড় বাজারে মাড়োয়ারীদের ঘরবাড়ী একটু দেখিয়া আসিলেই যথেষ্ট হইবে। ফলতঃ অর্থের ব্যবহারকে তত ভয় করিবার নাই, ভয় করিবার আছে অর্থের পুঁটুলি বাঁধাকে। অর্থের জন্য অর্থ-জমান, না খাইয়া

না পরিয়া শুধু অর্থ-জমান—এই একটা ব্যাধি মানুষের মধ্যে দেখিতে পাই। কিন্তু এই ব্যাধি কতখানি মানুষের স্বভাবের দোষ আর কতখানি সমাজ ব্যবস্থার দোষ তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। পাছে আমার অভাব হয়, পাছে আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের অভাব হয়, এই আশঙ্কা কৃপণতার মূলে কতখানি বিশেষতঃ আজকালকার দিনের এই সর্ব্ব-সাধারণ কৃপণতার মূলে—তাহা মনস্তত্ত্ববিদেরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবেন। সমাজের নূতন ব্যবস্থার ফলে ঐ আশঙ্কা যখন থাকিবে না তখন মানুষের কৃপণতা যে অনেকখানি দূরীভূত হইবে আর যতটুকু স্বভাবগত অন্তরাত্মাগত কৃপণতা থাকিয়া যায় তাহাও চারিদিকের হাওয়ার স্পর্শে ও শিক্ষাদীক্ষার আলোকে যে পরিষ্কার হইয়া যাইবে, ইহাও আশা করা যায়—অন্ততঃ যেটুকু যেখানে থাকিবে সেটুকু মারাত্মক রকমের হইবে না। তারপর এখন যেমন সমাজে একদিকে উচল ঐশ্বর্য্য আর একদিকে অতল দৈন্য সে রকম বৈষম্যের পরিবর্ত্তে ভাগবাটরার একটা সাম্য স্থাপিত হইলে, প্রয়োজনের বাড়া ঐশ্বর্য্য কিছু কিছু সকলের স্বভাবতই হইবে একথাও স্বীকার করা যাইতে পারে। পৃথিবীর মাটির উৎপাদন-ক্ষমতা অসীম না

হইলেও বিপুল, কামড়াকামড়ি, অন্যায় রকম ভাগাভাগি না হইলে তাহাতে প্রত্যেকের ঐশ্বর্য্য-লিপ্সা পরিতৃপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে ; আর মানুষের ঐশ্বর্য্য-লিপ্সারও কি কোনই সীমা নাই, সে লিপ্সা ছাড়া আরও অন্য প্রকার বলবত্তর লিপ্সা মোটেই নাই ?

এখন আলস্যের কথা। বলা যাইতে পারে, যে অলস হইয়া থাকিবে সে কিছুই পাইবে না, না খাইয়া মরিবে, সমাজ হইতে বিতাড়িত হইবে। কিন্তু ভিতর হইতে যে সাড়া পায় না, স্বেচ্ছায় যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে গেলে সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কারণ এ রকম ভাবে খাঁটি কাজ কিছুই পাওয়া যাইতে পারে না। আমাদের মনে হয় আলস্য জিনিষটা মানুষের স্বভাব নয়, মানুষের স্বভাবই হইতেছে কর্ম্ম করা—ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ ; তবে যে মানুষ কর্ম্ম করিতে চায় না বা অলস হইয়া পড়ে, তাহার কারণ সে মনের মত কাজ পায় না, ভিতরের প্রেরণা ও আনন্দ অনুসারে কাজ করিবার সুযোগ ও সুবিধা তাহার নাই, বাহির হইতে কাজের ভার তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। বাহিরের চাপের ফলে, গতানুগতিক ধারায় বেশীর ভাগ

মানুষকে সমাজে কাজ করিয়া আসিতে হইয়াছে—আলস্য আর কিছুই নয়, এই জোর জবরদস্তি করিয়া কাজ করিবার প্রতিক্রিয়া মাত্র। সমাজের ব্যবস্থায় যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, এমন কি স্বৈরাচারেরও অবকাশ থাকে, তবে আশা করা যায় প্রথম প্রথম আলস্যের ও উচ্ছৃঙ্খলতার কিছু প্রাদুর্ভাব হইলেও অল্প সময়ের মধ্যেই একটা সহজ সাম্যাবস্থা আসিবে, নিজের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম অনুযায়ী কাজ করিতে পারিয়া মানুষ আনন্দের সৃষ্টি সব অকাতরে করিতে থাকিবে, আর সমাজেরও তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

বর্ত্তমান সমাজের রোগের মূল হইতেছে এই যে প্রত্যেক মানুষকে সাক্ষাৎভাবে অন্নের চিন্তা করিতে হইতেছে, প্রত্যেক মানুষের কর্ম্মের আশু উদ্দেশ্য হইয়াছে কি করিয়া অর্থের সংস্থান হয়। মানুষ নিজের ভিতরের দিকে তাকাইতে পারে না, নিজের স্বভাব প্রবৃত্তি তলাইয়া দেখিবার সুযোগ পায় না; বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যেন-তেন প্রকারে নিজের গতর বিদ্যাবুদ্ধি শক্তি প্রবৃত্তি খাটাইয়া লইতে ব্যস্ত, সুবিধামত কোথায় আপনাকে বিক্রী করিয়া দিতে পারে তাহারই খোঁজ করিতেছে। মানুষের ভিতরের দেবতার এই যে দাস

বা গণিকা বৃত্তি—prostitution of the soul—ইহারই অন্য নাম বর্ণসঙ্কর। বর্ত্তমান যুগে খাঁটি ব্রাহ্মণ নাই, ক্ষত্রিয়ও নাই—আছে শুধু বৈশ্য ও শূদ্র, অর্থাৎ সেই দুই শ্রেণী যাহাদের মূল লক্ষ্য হইতেছে অর্থের ও অন্নের জোগাড় করা।

বর্ত্তমান সমাজের সমস্যা হইতেছে এই বৈশ্য ও শূদ্রের দ্বন্দ্ব। আমরা শূদ্রের সংজ্ঞা পূর্ব্বে দিয়াছি এই, যাহারা মাটি হইতে কাঁচামাল ফলায় আর বৈশ্যের সংজ্ঞা দিয়াছি এই, যাহারা সেই কাঁচামাল দিয়া নূতন নূতন জিনিষ তৈয়ারী করে ও সে সমস্ত সরবরাহ করে। কিন্তু আধুনিক যুগে কলকারখানার প্রাদুর্ভাবের পরে সমাজের যে নূতন গড়ন হইয়াছে তাহাতে সে সংজ্ঞার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কলকারখানার সৃষ্টির ফলে নূতন একদল শূদ্রের উদ্ভব হইয়াছে, ইহারা মাটি ছাড়িয়া আসিয়া কলকারখানার মজুর হইয়াছে। আর মাটি লইয়া যাহারা আছে, বাস্তবিক পক্ষে মাটি তাহাদের আর নাই, তাহারা মাটিতে কাজ করে বটে কিন্তু সে মাটির অধিকারী হইতেছে, সে মাটির ফলভোগ করিতেছে, মাটির সাথে সাক্ষাৎ শরীর সম্বন্ধ নাই যাহাদের সেই মহাজন ও জমিদার সম্প্রদায়। কলকারখানার মজুরেরাও

গতর খাটায় বটে কিন্তু লাভের অংশ পায় কলকারখানার মালিক যাহারা—মূলধনী যাহারা। আজকালকার শূদ্র হইতেছে চাষী ও মজুর, আর বৈশ্য হইতেছে মহাজন জমিদার মূলধনী। ফলতঃ আজকাল ধন উৎপন্ন করিতেছে শুধু শূদ্রেরাই, বৈশ্যেরা ধন উৎপন্নও করিতেছে না, যথাযথ সরবরাহ বা ভাগবাটরার সাহায্যও করিতেছে না, শূদ্রদিগকে খাটাইয়া, উপরচাল দিয়া নিজের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করিতেছে মাত্র। সমাজের ধন বৃদ্ধি করিতেছে না, বসিয়া বসিয়া নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে তাই এই অলস বৈশ্য শ্রেণীর (idle capitalist class) বিরুদ্ধে শূদ্রশ্রেণী (labour and peasant class) যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

ব্রাহ্মণে ও ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধ ইউরোপীয় ইতিহাসে একটা বিপুল ঘটনা—কিন্তু সে যুদ্ধের শেষ হইয়াছে—চার্চ্চের (church) অস্তিত্ব প্রায় লোপ পাইয়াছে আর state এরও নিজের সে মহিমা নাই, হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়া এখন বর্ত্তমান বৈশ্য শূদ্রের যুদ্ধে এক পক্ষের ছায়ায় ছায়ায় চলিয়াছে। ক্ষত্রিয় বা state এখন বৈশ্যের (capitalism) হাত ধরা—তাহার কারণ ও নিদান বিবৃত করিতে হইলে বিষয়টা অনেক দূর গড়ায়, তাই সে চেষ্টা হইতে বিরত

হইলাম। চার্চ্চ্ অবশ্য নাই, যতটুকু আছে ততটুকুর স্বার্থ রাষ্ট্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তির স্বার্থের সহিতই বিজড়িত। তবে নূতন একদল ব্রাহ্মণের উদ্ভব হইয়াছে—যাঁহাদের হারাইবার মত কোন সম্পত্তি নাই, যাঁহারা এক রকম নিঃস্ব কারণ তাঁহাদের বৃত্তি অর্থকরী নয়, যেমন কবি, শিল্পী, দার্শনিক, সাহিত্যিক, অধ্যাত্ম সাধক—ইঁহারা এক রকম সকলেই শূদ্রের পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন। শূদ্রের একাধিপত্য হইলে ইঁহাদের যে কিছু সুবিধা হইবে, Bolshevismএর ধরণ-ধারণ দেখিয়া ত তাহা মনে হয় না। তবে বর্ত্তমানে উভয়েই নিঃস্ব, উভয়েই একই ব্যবস্থার বলি, তাই বোধ হয় এই সৌহার্দ্দ। সে যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম বর্ণসঙ্করের কথা, সেই কথাটাই আর একটু বলিব।

সমাজে খাঁটি ব্রাহ্মণ নাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শ্রেণী বলিয়া কিছু নাই; কারণ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে অর্থোপার্জ্জনেরই একটা উপায় মাত্র। খাঁটি ক্ষত্রিয়ও সেই হিসাবে সমাজে নাই। এমন কি খাঁটি বৈশ্য ও শূদ্রও নাই আমরা বলিতে পারি, কারণ, কর্ম্ম হিসাবে সমাজে কেবল বৈশ্য ও শূদ্রই থাকিলেও, ধর্ম্ম হিসাবে নাই। বৈশ্য ও শূদ্র বৃত্তি লোকে অবলম্বন করিয়াছে, ভিতরের

প্রবৃত্তি অনুসারে নয় কিন্তু বাহিরের তাড়নার চাপে। আর ধর্ম্ম যেখানে নাই, সেখানে কর্ম্ম কর্ম্মের খোলস্ মাত্র। আজকাল সকলের সকল কর্ম্মের এক উদ্দেশ্য ও এক পরিসমাপ্তি—নিজের নিজের উদরপূর্ত্তি। সমাজের সমষ্টি-গত সত্তা বলিয়া যে কিছু আছে তাহা দেখিবার বা মানিবার কাহারও অবসর নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব। যাহাদের স্বার্থ এক রকম তাহারা মিলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যাহাদের স্বার্থ অন্য রকম তাহাদের সঙ্ঘের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বৈশ্যরাই একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছে—আজকাল শূদ্রেরা সে আধিপত্য নিজেদের জন্য কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিয়াছে। সমাজে মানুষের আর সব বৃত্তি প্রবৃত্তি যেন কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছে, সেখানে চলিয়াছে পশুর লড়াই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সব এক স্তরে নামিয়া আসিয়াছে—বিরাট হট্টগোলের মধ্যে সুবিধা মত পরস্পরে পরস্পরের টুঁটি চাপিয়া ধরিবার চেষ্টায় আছে।

কিন্তু আমরা যে রকম ব্যবস্থার কথা বলিয়াছি, সমাজে যদি সেই রকম ব্যবস্থা হয়—অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি অন্ততঃ জীবনধারণোপযোগী করিয়া মাটির

স্বত্ব বা উপস্বত্ব ভাগ-বাটরা করিয়া দেওয়া হয় আর প্রত্যেককে যদি চলিতে দেওয়া হয় অন্তরাত্মার প্রেরণা, নিজের নিজের ধর্ম্ম অনুসারে, সমাজ যদি ব্যষ্টির ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করে ও তৎপরিবর্ত্তে ব্যষ্টির স্বধর্ম্ম-সৃষ্ট সম্পদই কেবল আদায় করে তবে সমাজে সকল গোলমালেরই অবসান হয়। এ রকম সমাজ সম্ভব কি না, তাহা পরের কথা। কিন্তু আদর্শ সম্মুখে রাখিতে কোন দোষ নাই। আর সত্যই কি ইহা শুধু আদর্শ, শুধু স্বপ্ন ? সমাজের নানা বিপ্লব নানা বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া একটা ফল্গু-প্রবাহ এই রকমই একটা পরিসমাপ্তির দিকে ছুটিয়াছে না কি ?
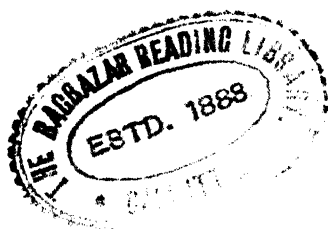
মানুষ ও যন্ত্র

আজকাল সর্ব্বত্রই কথা উঠিয়াছে যন্ত্রের, যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। যন্ত্রাসুরের গোঁড়া ভক্ত যে ইউরোপ সেও এখানে ওখানে ইতিমধ্যে একই সুরে বেশ প্রতিবাদ তুলিয়া দিয়াছে। মানুষকে বাঁচাইতে হইলে তাহাকে যন্ত্রের কবল হইতে মুক্ত করিতে হইবে। যন্ত্রের অর্থ যে শুধু কলকারখানা তা নয়, কলকারখানার মত সব রকম ব্যবস্থা বন্দোবস্ত। যন্ত্র কাহাকে বলি? যন্ত্রের উদ্ভব সমাজে আদৌ হইল কেমন করিয়া? যন্ত্র হইতেছে অল্প ব্যয়ে অধিক ফল সংগ্রহ করিবার কৌশল। কোন একটী বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দরকার অনেকগুলি

শক্তি, ও সেই শক্তিগুলিকে একমুখী করিয়া ধরা। অবান্তর শক্তি যত বাদ দিতে পারি, প্রয়োজনীয় শক্তি যত সংগ্রহ করিতে পারি এবং সেগুলিকে যথাযোগ্য ভাবে বিন্যস্ত করিয়া কেবল একই লক্ষ্যে খাটাইতে পারি—এই হইল যন্ত্রের গোড়ার কথা। বহু জিনিষের সমাবেশ যেখানে, সেখানে যখন প্রত্যেক জিনিষ কাজ দেয় ও কাজ দিতে পারে ততটুকু ও ততখানি, যতটুকু ও যতখানি একটা সমবেত উদ্দেশ্য সাফল্যের জন্য প্রয়োজন, তখনই যন্ত্রের উদ্ভব। সমাজ হইতেছে ব্যক্তি-শক্তির সংহতি। সমাজের বিধি-ব্যবস্থা যখন এমন হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন ভাবে যথেচ্ছ চলিতে পারে না কিন্তু তাহার প্রত্যেক কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয় গোটা সমাজের সেবায়, এই সামাজিক উদ্দেশ্য ছাড়া ব্যক্তিগত আনন্দের ও প্রেরণার যখন কোন স্থান থাকে না, তখনই সে সমাজ হয় একটা যন্ত্র। এই যেমন বোলশেভিকেরা বলিতেছেন সমাজের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থার জন্য, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই এই জিনিষও এতখানি উৎপাদন করিতে হইবে ও প্রত্যেকের নিজের প্রয়োজনের জন্য থাকিবে তার এতটুকু ভাগ—অথবা জর্ম্মণী যেমন কিছুদিন আগে বলিতেছিলেন দেশের প্রত্যেক সন্তান

হইতেছে সমস্ত রাষ্ট্রের এক একটী অঙ্গ, প্রত্যেকের শিক্ষাদীক্ষা ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব নিয়ন্ত্রিত হইবে ঐ রাষ্ট্রের রক্ষার ও ঋদ্ধির জন্য, তখন সমষ্টিগত জীবন যে ছাঁচ পায় তাহাকেই বলি যন্ত্র। প্রত্যেক মানুষ যদি আপনার বলে চলে, নিজের নিজের মন-গড়া একটা আদর্শ লইয়া ছোটে, তবে জোট বাঁধা হয় না, সমাজের দেহ নিরেট এক হইয়া উঠিতে পারে না, তাহা খসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। ব্যক্তির স্বৈরগতি যত খর্ব্ব করা যায় শক্তির অনর্থক উদ্দেশ্যহীন ব্যয় তত কম হয়, যতটুকু শক্তি আছে তাহা সব নিযুক্ত হয় গোষ্ঠীগত সেবার কল্পে। কলকারখানার মধ্যে ঠিক ঐ উদ্দেশ্যটিই মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, চরম সার্থকতা পাইয়াছে। আলাদা আলাদা ভাবে ঘরে বসিয়া জিনিষ তৈয়ারী করিতে গেলে, ব্যক্তির খেয়ালের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়, তাহাতে সময়ের ও পরিশ্রমের ব্যয়াধিক্য। তা ছাড়া মানুষের হাতের শক্তির চাইতে বড় শক্তি হইতেছে প্রকৃতির শক্তি। সুতরাং প্রকৃতির শক্তি ষ্টীম, বিদ্যুৎ যাহাতে বাঁধা যায় এমন কিছু কর এবং মানুষকে তাহার মধ্যে আবার বাঁধিয়া দাও। দশ দিনে সহস্র মানুষের কাজ যাহাতে একঘণ্টায় একটি মানুষ করিতে পারে, সেই

কৌশল আয়ত্ত করিতে গিয়া মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে কল-কারখানা।

যেখানে মানুষের প্রাণের রঙ নাই, মানুষ যেখানে আপনাকে মানুষ বলিয়া বোধ করে না, মানুষ যেখানে একটা স্বাধীন সত্তা অনুভব করে না, কাজ যেখানে হয় কেবল আইন-কানুনের জোরে ধরা-বাঁধা আটা-সাঁটা নিয়মের বশ, সেইখানেই পাই যন্ত্র, যান্ত্রিকতা। ভারতে ব্রিটিশ শাসন, শুধু ভারতের কথা কেন, জগতের সকল দেশেই যে রাজ্যশাসন পদ্ধতি চলিতেছে—তাহা ঠিক যন্ত্রই। সে পদ্ধতির মূল প্রতিষ্ঠা হইতেছে আইন-কানুন (Law), সেই আইন-কানুন কাজ করিয়া চলিয়াছে সোজাসুজি অব্যর্থ অটুট ভাবে। সে একটা শৃঙ্খলা, তাহার মধ্যে মানুষ আর মানুষ নয়, মানুষ যেন দাবার বড়ের মত—বাঁচিতে হয় মরিতে হয় তার নিজের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নয়। মানুষ এখানে যেন একটা নির্ম্মম নিয়তির হাতে জড় ক্রীড়নক মাত্র। আমাদের বিচারপতি যখন বিচারাসনে উপবেশন করেন, তখন তাঁহার মনুষ্যত্ব ভুলিয়া যাইতে হয়—নিরপেক্ষতার নামে তাঁহাকে হইতে হয় নিয়মাবলীর একটা শুষ্ক কঠোর বিগ্রহ। আমাদের বর্ত্তমানের সমাজ-যন্ত্রে মানুষ-ভাবের খোলস বাহিরে

ফেলিয়া আসিয়া যে বিচারপতি বিচারালয়ে যত অ-মানুষ হইতে পারেন, তিনিই তত বড় ন্যায়ের মূর্ত্তি।

মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে যে মানুষই হইতেছে নিয়ম-কানুনের স্বষ্টিকর্ত্তা। নিয়ম-কানুন যখন সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া উঠে, মানুষকে তাহার দাস অসহায় জড়পুত্তলিকা বানাইয়া ফেলে তখনই হয় সমাজের রোষের উদ্ভব। তখন সে নিয়ম-কানুন ভাঙ্গিয়া ফেলা ছাড়া উপায় নাই। বিধি-ব্যবস্থারূপ যন্ত্রের হাত হইতে মানুষের মানুষ-ভাবকে উদ্ধার করিবার জন্য, সমাজের অ-মানুষ শৃঙ্খলা হইতে মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব মুক্ত করিবার জন্য, যে একটা নিত্য আহ্বান মানুষের অন্তরাত্মার আছে তাহা বহুপূর্ব্বে গ্রীক-কবি সফোক্লা তাঁহার অনুপম-স্বষ্টি বালিকা আন্তি-গোণার চরিত্রের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। আন্তিগোণা বলিয়াছিল মানুষের হাতে লেখা যে শাস্ত্র, যে নিয়ম-কানুন, তাহা অপেক্ষা মহীয়ান গরীয়ান হইতেছে মানুষের অন্তরাত্মার মধ্যে আছে যে অলিখিত অপৌরুষেয় সনাতন ধর্ম্ম।

গোষ্ঠীগত জীবনের জন্য বিধি-ব্যবস্থা আইন-কানুন অর্থাৎ একটা নিয়মের শৃঙ্খলার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে জিনিষটা যাহাতে অন্তঃকরণশূন্য অন্ধ যন্ত্রের মত না

হইয়া পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। কি রকমে তাহা সম্ভব? প্রাচীনকালে বিধি-ব্যবস্থা বা শাস্ত্রের মধ্যে মানুষ-ভাব—একটা সজীব সরস ব্যক্তি-হৃদয়ের ব্যঞ্জনা জিয়াইয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সব জিনিষে সব ক্ষেত্রে শাস্ত্রের অপেক্ষা শাস্ত্র যাঁহার মধ্যে জীবন পাইয়াছে এমন ব্যক্তির উপরই বেশী জোর দেওয়া হইত। তাই দেশের শাসন-শৃঙ্খলার জন্য আইন-কানুনকে তত শ্রদ্ধার আসন দেওয়া হইত না, যত দেওয়া হইত সেই আইন-কানুনের প্রতিনিধি যে রাজা রাষ্ট্রপতি সেই মানুষটিকে। সামাজিক ব্যাপারে তাই ছিলেন সমাজপতি। শিক্ষাক্ষেত্রে আজ-কালকার মত একটা আইন-কানুনের আয়তনই মূল কথা ছিল না, শিক্ষার কেন্দ্র ছিলেন গুরু। এই রকমে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিয়ম-কানুনের চাপ ততটা অনুভব করিত না, নিয়ম-কানুনের মধ্যে একটা মানুষী সম্বন্ধের অবকাশ পাইত। এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্রেও সৈনিককে আজকালকার মত একটা মস্তকহীন প্রাণহীন বিধি-ব্যবস্থার বিরাট যন্ত্রের অঙ্গমাত্র হইয়া যাইতে হইত না—সেনাবাহিনীর যে প্রাণই সেনাপতি, তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবই যন্ত্রটিকে একটা সজীব জিনিষ করিয়া ধরিত। নেপোলিয়ন তাঁহার বিপুল অক্ষৌহিণীকে কেমন

অবলীলাক্রমে খেলাইয়া চালাইয়া লইয়াছিলেন, একটি জীয়ন্ত মানুষের মতনই করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার কারণ প্রত্যেক সৈন্য অনুভব করিত সেই মহাপুরুষের ব্যক্তিগত স্পর্শ, প্রত্যেক সৈন্য বোধ করিত তাহার নিজের মানুষ-সত্তা, নিজেকে কলকব্জার মত একটা বড় যন্ত্রের উপকরণ মাত্র বলিয়া বোধ করিত না।

এ পথেও বিপদ আছে। শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে যখন বিশেষ ব্যক্তিকে স্থাপন করি তখন সে ব্যক্তির খেয়াল অনেক সময়ে ভয়ের কারণ হইয়া উঠে। রাজা যখন অত্যাচারী হইয়া উঠেন, গুরু যখন "বামুন-ঠাকুর" হইয়া পড়েন, তখন সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটি দুর্দ্দশার কথা বটে। কর্ত্তার এই খেয়াল দূরীকরণের জন্যই আইন-কানুনের কড়াকড়ি, ডেমক্রাসির উদ্ভব। নিয়মের ধরা-বাঁধা থাকিলে, আর কিছু না হউক একটা শান্তি, একটা সমান সুর সমাজের শৃঙ্খলায় বজায় থাকে—অতিরিক্ত ওলট-পালটের ভয় থাকে না। এ কথা স্বীকার করিলেও, জিজ্ঞাস্য থাকিয়া যায়—নিয়মের শান্তি ও সাম্যভাব যদি মরণের জড় বস্তুর শান্তি ও সাম্যভাব আনিয়া দেয়, তবে তার চেয়ে ব্যক্তির অনিয়ম যদি একটা উচ্ছৃঙ্খল বা নির্দ্দেশহীন সজীবতাও আনিয়া দেয়, তাই কি বেশী মঙ্গলের নয়?

সে কথা যাক, কিন্তু আসল প্রশ্ন, এই দুইএর সামঞ্জস্য কোন রকমে হয় কি না। যান্ত্রিকতার পীঠস্থান ইউরোপ যন্ত্রের কলকারখানার ব্যবস্থার এমন সঙ্কটস্থানে আজ আসিয়া পড়িয়াছে যে সে'ও এই প্রশ্ন তুলিয়াছে। ধনিকের ও শ্রমিকের মধ্যে যে বিপুল দ্বন্দ্ব ইউরোপীয় সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহার মূলে হইতেছে যান্ত্রিকতার অ-মানুষ পীড়ন। তাই ইউরোপের মনীষিরা অনুসন্ধান করিতে করিতে একটা industrial psychology, কলকারখানায় নিষ্পিষ্ট শ্রমিকদের মনস্তত্ত্বের কথা আবিষ্কার করিতেছেন। তাহার মূল কথা এই যে যান্ত্রিকতার মধ্যে ব্যক্তি-ভাবের মানুষ-ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, নতুবা সমাজের শৃঙ্খলা অতিরিক্ত ধরা-বাঁধার ফলে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে।

শৃঙ্খলা যাহাতে শৃঙ্খল না হয়, বিধি-ব্যবস্থা থাকিবে অবশ্যই, কিন্তু সেটি মানুষ-ভাবের ব্যঞ্জনায় যাহাতে সরস হইয়া উঠে, সমষ্টিগত জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে আপন ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধই স্থাপন করিতে পারে—সমাজকে যাঁহারা নূতন করিয়া গঠিত করিতে চাহিতেছেন তাঁহাদের সম্মুখে থাক এই সমস্যা।

বাস্তব ও ভবিতব্য

ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের উপর গঠিত—এটা অতি পুরাতন, সকলের জানা ও মানা কথা। কিন্তু গোলমাল উপস্থিত হয়, ঐ কথাটির গোড়ার দুটি শব্দের কোন্‌টি বেশী জোর দিয়া বলিব তাহা লইয়া। কেহ জোর দেন ভবিষ্যতের উপর, কেহ বা জোর দেন বর্ত্তমানের উপর। এবং এই জোর দেওয়ার পার্থক্যের ফলেই উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী, কর্ম্মপদ্ধতি, এমন কি লক্ষ্য পর্য্যন্ত পৃথক হইয়া পড়ে। "যাহা হইবে" তাহার প্রতিষ্ঠা হইতেছে "যাহা আছে"। সুতরাং একদল বলিতেছেন "যাহা আছে" সেইটিই আসল কথা। কি আছে ভাল

করিয়া দেখ, তবেই বুঝিবে তাহার মধ্যে কতদূর কি সম্ভাবনা। নতুবা শেষে আফশোষ করিবে—"আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে"। হাতের কাছে যে উপকরণ আছে তাহাই তোমার আদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, বাঁধিয়া দিতেছে। "আছে যাহা" সে সম্বন্ধে যাহাদের সম্যক্ জ্ঞান নাই তাহাদিগকেই বলে কাণ্ডজ্ঞান-হীন। বস্তুজ্ঞান, ফ্যাক্ট্ (Fact)এর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই হইতেছে কুশলী কর্ম্মীর কথা। ইউরোপের দিকে চাহিয়া দেখ। ইউরোপ এত বড় কেন? ইউরোপ বড় তার সায়ান্সের (Science) জোরে, আর সায়ান্স (Science) হইতেছে চরম বস্তুজ্ঞান। ইউরোপ জানে সে কি ধরণের জিনিষ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, সে সব জিনিষের ধর্ম্ম কি, কর্ম্ম কি, আর সেই পথে চলিতেছে। যাহা দিয়া যাহা গড়া যায় তাহা দিয়া সে তাহাই গড়িতেছে, যাহা দিয়া যাহা গড়া যায় না কখন সে দিকে সে দৃষ্টিও দেয় না। কাণ্ডে যাহা নাই তাহার জন্য চেষ্টা বকাণ্ড-প্রত্যাশা। ভাবুকদের ভুল এইখানে, তাঁহারা বর্ত্তমানকে চেনেন না, ভবিষ্যতের উপর তাঁহাদের এমন ভক্তি যে বর্ত্তমানের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতেও তাঁহাদের ভয় হয়।

বাস্তব ও ভবিতব্য

ভাবুকরা বলেন ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানের উপর দাঁড়াইতে হয় হউক। কিন্তু বর্ত্তমানটা হইতেছে আশ্রয়, অবলম্বন মাত্র। ভবিষ্যৎটাই আসল কথা। তোমার মনে যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে লক্ষ্য জাগিয়াছে, সেই অনুসারেই তোমার পথ ঠিক করিতে হইবে, সেই অনুসারেই বর্ত্তমানকে ঢালিতে পিটিতে হইবে। বস্তুর, ফ্যাক্ট্ এর নিজস্ব নিত্যধর্ম্ম কিছু নাই—তুমি উহার মধ্যে যে ধর্ম্ম প্রবেশ করাইয়া দিবে, সেই ধর্ম্মেই উহা গড়িয়া উঠিবে। কাণ্ডের রূপান্তর ত এই রকমেই হয়। তোমার কাণ্ডজ্ঞান লইয়া যদি পাথরের রাসায়নিক বিশ্লেষণে চিরদিন নিযুক্ত থাকিতে, সেই জ্ঞান দিয়াই যদি পাথরের ধর্ম্ম-কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিতে, তবে পাথরের ভিতর হইতে অপরূপ শিল্পমূর্ত্তি সব কোন দিন ফুটিয়া উঠিত না। শব্দকে যদি কেবলি জানিতাম বাতাসের তরঙ্গ বলিয়া, তবে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা কোন দিনই শুনিতে পাইতাম না। এ সব ক্ষেত্রে বস্তুর জানা ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হই নাই, একটা অজানা লোকের ধর্ম্মই টানিয়া আনিয়া বস্তুর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছি, বস্তুর স্বভাব স্বরূপ পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিয়াছি। সকল সৃষ্টির ব্যাপারেই এই রকম হয়। মাট্‌সিনি যে উপকরণ—যে

লোকবল ও অস্ত্রবল—লইয়া ইতালীর স্বাধীনতার জন্ম লাগিয়া গিয়াছিলেন, তিনি যদি সেই সব উপকরণের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিতেন, তবে দেখিতেন সে ধরণের ভাঙ্গাচুরা পচাগলা জিনিষ দিয়া কোন দিন কিছু করা সম্ভব নয়। বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতের দিকে চলা নয়, আসল পদ্ধতি হইতেছে ভবিষ্যৎ হইতে বর্ত্তমানের দিকে চলিয়া আসা।

এই দুই দলের দুই কথার সামঞ্জস্য আমরা করিতে চেষ্টা করিব। কারণ, উভয়েরই মধ্যে কিছু কিছু সত্য আছে—বিপরীত দিকের চূড়ান্ত জের যেখানে আসিয়া মিশে সেইখানেই পুরা সত্য। বস্তুবাদী যখন বলেন বস্তুকে জানিতে হইবে, যাহা আছে তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মের পরিচয় লইতে হইবে, বর্ত্তমানের সম্ভাবনার খোঁজ লইতে হইবে, তখন তাঁহারা অন্যায় কিছু বলেন না। কিন্তু কথা হইতেছে—এই অনুসন্ধান তাঁহারা কতদূর পর্য্যন্ত চালাইয়া লইতে পারিয়াছেন। ফ্যাক্ট্‌এর গভীরতর গভীরতম প্রদেশে নিবিড়তর নিবিড়তম অন্তস্তলে পৌঁছিতে হইবে। নতুবা আমরা পাইব উপরকার ভাসা স্তরের ক্ষণিক ধর্ম্ম। বর্ত্তমানের সব সম্ভাবনা ধরিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমানের ব্যক্তরূপের পিছনে

যে ব্যক্তশক্তি এবং ব্যক্তশক্তিরও পিছনে যে শক্তিগর্ভ সত্তা আছে তাহার গুণের সন্ধান লইতে হইবে। আর এ কাজটি কেবল বস্তুবাদীর বিশ্লেষণমুখী দৃষ্টি দিয়া হয় না, সাহায্যের জন্য দরকার ভাবুকের কল্পনা, সূক্ষ্ম অনুভব, দিব্য দৃষ্টি। কিন্তু ভাবুকের ভুল হয় তখন যখন তিনি ভাবাবেশের, নিজের বাসনার আকাঙ্ক্ষার স্রোতে ঢলিয়া ভাসিয়া চলেন। চিত্তাবেগ যে রঙীন স্বপ্ন গড়িয়া তোলে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যে মনের মতন রূপ আঁকিয়া দেয় তাহা বাস্তবে সফল হইবে না, জীবন্ত হইবে না যদি বাস্তবের গভীরতম সত্তার সহিত তাহার অব্যর্থ মিল অটুট সংযোগ না থাকে। স্বপ্ন দেখা চাই কিন্তু সে স্বপ্ন হওয়া দরকার সত্যসন্ধ; মনের খেয়াল দেখে এক স্বপ্ন, কিন্তু যে স্বপ্ন ফলে তাহা হইতেছে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির স্বপ্ন, অপরোক্ষানুভূতির স্বপ্ন।

বিচার-বুদ্ধি দিয়া বর্ত্তমানের স্বরূপকে বাঁধিয়া দেওয়া যায় না। বিচার-বুদ্ধি দেখিতে পারে বর্ত্তমানের আজকার রূপ আর যে শক্তি সেই রূপ দিয়াছে তাহার কিছু কিছু —হয়ত তারই জোরে জানিতে পারে কালকার শক্তির কিছু ও কালকার একটা রূপ। কিন্তু পরশু দিনের কথা সে খুব ভয়ে ভয়েই বলিতে পারে। অন্যপক্ষে ভাবালুতা

যে পরশু দিনের খবর আনিয়া দেয় তাহাও যে সব সময় ঠিক ঠিক হইবে এমনও কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ ভাবালুতা ভবিষ্যতের চিত্র গড়িয়া দেয়, ভবিষ্যতের ভাব দিয়া ততখানি নয় যতখানি বর্ত্তমানের অভাব দিয়া। আমার প্রাণের যে আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমানে মিটিতেছে না, তাহা মিটিবে যে রকমে আমার বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস অনুযায়ী গড়ন দিয়া আমি ভবিষ্যৎ রচনা করিতেছি। বিশ্বাসেরও রকমফের আছে, সব বিশ্বাসই পাহাড় টলাইতে পারে এমন কোন কথা নাই। মাট্‌সিনির বিশ্বাস ইতালীকে স্বাধীন করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আর একটি বিশ্বাস যে ইতালী হইবে নূতন যুগের নূতন মানবজাতির নূতন দীক্ষাগুরু, তাহা কার্য্যতঃ সফল হয় নাই।

সবই হইতেছে সত্যের ও শক্তির কথা। বাস্তববাদী এক ধরণের সত্য ও শক্তি লইয়া চলিয়াছেন—যাহা ব্যক্ত, যাহা আছে তাহার সত্য ও শক্তি লইয়া। আর ভাববাদী চলিয়াছেন আর এক ধরণের সত্য ও শক্তি লইয়া—যাহা অব্যক্ত, যাহা হইতে পারে তাহার সত্য ও শক্তি লইয়া। বাস্তববাদী দাঁড়াইয়াছেন বুদ্ধির জোরের উপর, ভাববাদী আশ্রয় লইয়াছেন চিত্তাবেগের তোড়ের উপর। ভবিষ্যৎকে

এই দুই রকমেই গড়া যায়, কিন্তু কিছুদূর পর্য্যন্ত— ফলতঃ আমরা দেখি ভবিষ্যৎ যখন বাস্তবিক গড়িয়া উঠে তখন রূপ নেয় একটা তৃতীয় ধরণে, কি বস্তুবাদী কি ভাববাদী কেহই তাহা দেখিতে পারেন নাই বা দেখিয়াছেন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা রকমে। সে তৃতীয় রূপটিকে ফলাইয়া ধরিবার পথে বস্তুবাদীর বুদ্ধিবল কাজ করিয়াছে, ভাববাদীর প্রাণের আবেগও হয়ত তাহার অপেক্ষা বেশী কাজ করিয়াছে; কিন্তু আসল শক্তি দুইএরই সীমার বাহিরে।

কি সে শক্তি? কোথাকার সত্যে তাহার প্রতিষ্ঠা? সেই সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে ঋষিদৃষ্টিতে, সেই শক্তি উৎসারিত হইতেছে তপোবলে। আমাদের স্থূল-চক্ষে যাহা বস্তু বা কাণ্ড অর্থাৎ ফ্যাক্ট্ বলিয়া দেখা দেয়, তাহা সেই সত্য ও শক্তির ক্রম-পরিণাম ধারার একটা বিশেষ সাম্যাবস্থা (poise, equilibrium). কিন্তু এই সাম্যাবস্থা নিরেট চিরন্তন কিছু নয়, সে সাম্য আপেক্ষিক সাম্যমাত্র— সে সাম্য ভাঙ্গিয়া গিয়া আবার নূতন একটা সাম্যের দিকে, নূতন বস্তু বা কাণ্ড বা ফ্যাক্ট্ স্বজনের দিকে গড়াইয়া চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক যেমন বলিয়া দিতেছেন— একটা বৈদ্যুতিক শক্তিধারা স্তরের পর স্তরে কেন্দ্রগত

হইয়া এক একটা স্থির সাম্যাবস্থা পাইয়া এক এক রকম মূল ভৌতিক দ্রব্য (element) স্বজন করিতেছে—ইউরেনিয়ম্ এই রকম একটি স্থির সাম্যাবস্থা, উহা ভাঙ্গিয়া গিয়া লইতেছে থোরিয়ম্ বলিয়া আর একটি সাম্যাবস্থা, থোরিয়ম্ ভাঙ্গিয়া রেডিয়ম্ হইতেছে এবং এই রকমে ক্রমে সীসা, পারা ও সোণার উৎপত্তি হয়—সেই রকম ঘটনার জগতেও একটা শক্তির ক্রম-পরিণামী ধারায় ফ্যাক্ট্‌এর পরিবর্ত্তন হইয়া চলিয়াছে। অতীতের বাস্তব বর্ত্তমানের বাস্তবকে জন্ম দিতেছে, বর্ত্তমানের বাস্তব ভবিষ্যতের বাস্তবকে জন্ম দিতেছে। বস্তুবাদীর ভুল হয় এইখানে যে তিনি অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ফ্যাক্ট্‌কে সব একই কোঠায় ফেলিয়া দেখিতে চাহেন অর্থাৎ সীসাকে তিনি সীসা ভাবেই দেখেন, তাহার সহজ স্বাভাবিক পরিণামই যে সোণা তাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। ভাববাদী বিশ্বাস করেন আজকার কলিযুগ কালকার সত্যযুগে পরিণত হইতে পারে অর্থাৎ সীসা সোণায় পরিণত হইতে পারে—কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসের গোড়ায় অভাব জ্ঞানের দৃষ্টির। তিনি সে কাজটি করিতে চান যাদুবিদ্যার (alchemy) জোরে। ভাববাদীর সোণার স্বপ্ন সব বিফল হইতেছে ও হইবে যদি তিনি

যাদুবিদ্যার পথ ছাড়িয়া বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান ও দৃষ্টির পথ না খোঁজেন। তিনি যেদিন শক্তির মূল ধারাটির অনুসন্ধান পাইবেন, তাহার ক্রম-পরিণামের রহস্য উদ্ঘাটন করিবেন, সেই দিন তিনি বস্তুকে বাস্তবকে যথেচ্ছ সত্যসন্ধ করিয়া বদলাইতে পারিবেন।